Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি: রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা খাতুন

রোলঃ 228020585

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি: রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা খাতুন

রোলঃ 228020585

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী অর্থনীতি: রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমা খাতুন, আইডিঃ 228020585 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী অর্থনীতি: রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নাজমা খাতুন

আইডিঃ 228020585

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

সীমাবদ্ধতা ও উদ্দেশ্য: 6

অধ্যায় এক: ইসলামি অর্থনীতি 6

অর্থনীতির সংজ্ঞা: 6

ইসলামি অর্থনীতি: 8

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদ: 11

পুজিবাদ ও ইসলামি অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য: 20

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ 21

রিবা: 21

রিবার প্রকারভেদ: 22

আল কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে সুদের হুকুম : 27

সুদ ও ইসলাম: 30

জাহেলী যুগের রিবা: 33

ব্যবসা ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য : 34

রিবা হারাম হবার কারণ: 36

তৃতীয় অধ্যায়: আধুনিক ব্যাংকিং 41

ব্যাংকিং: 41

ব্যাংকের লাভ ও এর হুকুম: 42

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ 43

আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি: 44

ইসলামী ব্যাংক 46

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান কার্যক্রম: 48

চতুর্থ অধ্যায়: বিকল্প সমাধান 49

সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা: 49

ব্যাংকিংয়ের শরীয়তসম্মত পন্থা 51

ব্যাংক ও ডিপোজিটরের সম্পর্ক 51

শিরকাত ও মুদারাবা: 52

মুদারাবা ও মুশারাকা: 53

বাইয়ে সালাম: 58

ইজারা 60

মুরাবাহা: 61

বাকিতে বেচাকেনা: 64

কর্যে হাসানা: 64

যাকাত: 64

উপসংহার : 65

গ্রন্থপঞ্জি: 66

ভূমিকা:

الحمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وعلى اله وصحبه أَجْمَعِينَ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের মালিক। দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

আধুনিক বিশ্বে অর্থ অন্য সবকিছুর চাবিকাঠি হস্তগত করে কাণ্ডারির আসনে সমাসীন হয়ে আছে। তুচ্ছ কিছু থেকে নিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য বিস্তারের মূল নিয়ামক এখন অর্থ। অর্থ এখন দস্যি। অন্যসব নস্যি। এ দস্যির ধকলে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক এ দানবীর পদতলে মানবতা পিষ্ট-ক্লিষ্ট। শাসন, ক্ষমতা, আধিপত্য, ভোগ-বিলাসের অবৈধ হাতিয়ার বানানো হয়েছে অর্থ-সম্পদকে। এ জন্যে চলছে উৎপাদন আর বাজার দখলের আধিপত্যবাদী ঠাণ্ডা লড়াই। উদ্ভাবন করা হচ্ছে নতুন নতুন থিওরী। লেখা হচ্ছে গাদা গাদা গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে পেটুক পেটুক দাতা সংস্থা। নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে সুদী ঋণের। ফাঁদ ফেলে জালে আঁটকানো হচ্ছে মযলুম মানবতাকে। যেমন আপনি দেখে থাকেন হরিণদের অরণ্যে হায়েনাদের রাজত্ব।

তাই ' ইসলামি অর্থনীতি ' কথাটি পুঁজিবাদী, ভোগবাদী ও আধিপত্যবাদীদের সবচেয়ে বড় গা-জ্বালার বিষয়। ওদের কাছে এর সমাধান একটাই-'শুধু আমার চাই'।
কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। শুধুমাত্র ইসলাম। কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা, মানুষের যিনি স্রষ্টা।

যে কয়টি প্রধান প্রধান উপাদান আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার অন্যতম হলো অর্থ। কারো কারো মতে তো অর্থই নিয়ন্ত্রক শক্তি। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে কার্যকর করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাও তার অবাস্তব নীতির ফলে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে নিজ ঘরেই আত্মহত্যা করে। এখন চলছে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির ছড়াছড়ি। আমাদের চোখের সামনে আছে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক মতবাদ। এভাবে একটার পর একটা মতবাদ আসছে আর পরীক্ষা চলছে। কোনোটিই মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পারেনি, দিতে পারেনি মুক্তি। এ হচ্ছে একটি দুষ্টচক্র যার মধ্যে মানুষ বৃথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং প্রতিটি আবর্তনে যার অবস্থা হলো এ প্রবাদ বাক্যের মত:

**"রশির জট খুলে চলেছি দিবানিশি
আগা পাছার নেইকো খোঁজ!"**

আসলে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো মতবাদই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনা। মানুষের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র খোদায়ী বিধান, তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আর এ জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সকল বিভাগকে পরিচালিত করবার সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামী অর্থনীতিই অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।

সীমাবদ্ধতা ও উদ্দেশ্য:

ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক খুবই কম। বলতে গেলে কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া বাংলায় রচিত ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে হাতে গোনা। বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের একান্ত অভাব স্বত্তেও জানার অদম্য আগ্রহ ও আমাদের সমাজে বর্তমান অর্থব্যবস্থায় সুদের চরম ভয়াবহতা এবং এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য ইসলামি অর্থনীতি বিকশিত হলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় উন্নতি ও শান্তি ফিরে পাওয়ার যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তা তুলে ধরা ও নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস থেকে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, আলহামদুলিল্লাহ।

অধ্যায় এক: ইসলামি অর্থনীতি

অর্থনীতির সংজ্ঞা:

অর্থনীতির আভিধানিক অর্থ হল অর্থ সংক্রান্ত বিধি-বিধান। অর্থনীতি আরবী النظام الاقتصادي -এর প্রতি শব্দ। قصد "কসদুন" মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। قصد বা اقتصاد -এর আভিধানিক অর্থ হল রুচিসম্মত চালচলন, মধ্যমপন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় জীবন যাপণের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে, এজন্য একে النظام الاقتصادي বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Economics। মূলতঃ গ্রীক শব্দ Oikonomia থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ হল 'গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনা'। মনে করা হয় যে, প্রাচীন কালে গ্রীক দেশে অর্থনীতির প্রথম সূচনা হয় গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনার সীমিত পরিসর থেকে। তাই তখন একে Oikonomia বা Economics নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র যেহেতু সে কালের গৃহস্থলীন ব্যস্থাপনারই সম্প্রসারিত রূপ তাই অর্থশাস্ত্রকে Economics নামেই অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: অর্থনীতির গবেষক আল্লামা হিফজুর রহমান সিওহারভী (রাহ.) অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "অর্থনীতি এমন এক শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করলে এমন সব নীতিমালা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যা সম্পদ আহরণ ও ব্যায়ের যথার্থ পন্থা ও সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, সম্পদ বিনষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালার শুদ্ধশুদ্ধি যাচাইয়ের প্রজ্ঞা দান করে।"

ডঃ আব্দুল্লাহ মুহসিন আত্বরিকী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন- যে বিদ্যা অর্জন করলে সম্পদ উপার্জন ও তা ব্যায় এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে অর্থনীতি বলে।

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মাওঃ আব্দুর রহীম অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "মানুষের জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তা পূরণ করার উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে যে সমাজ বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় তার নাম অর্থনীতি"।

পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরাও অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল একে 'গৃহপরিচালনার বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের ধ্যান ধারণায় যথেষ্ট পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা ও মূল্যবোধেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এ কারণে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও ক্রম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' এবং সংজ্ঞায় বলেছেন যে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে"।

পরবর্তী কালে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, "অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে"।

আধুনিক কালের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'লায়নেল রবিন্স' অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন যে, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহার যোগ্য অপ্রতুল সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করে।

সুতরাং এই সীমিত সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করে মানুষ তার সীমাহীন অভাবকে পুরণ করতে পারে এটিই অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে, অভাব ও তৃপ্তি লাভের প্রয়োজনীয় উপকরণ গুলোর স্বল্পতা থেকেই মানবজীবনে অর্থনৈতিক সংকটের উৎপত্তি ঘটেছে। মানুষের জীবনে প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। একটা প্রয়োজন পূর্ণ হলে আরেকটা প্রয়োজন এসে দেখা দেয়। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই মানুষ ছুটে চলে দেখা দেয় অহর্নিশ। বস্তুতঃ এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদই পৃথিবীর চাকাকে সচল করে রেখেছে, জীবনকে করে রেখেছে সক্রিয় ও গতিশীল। পৃথিবীর অধিকাংশ কর্মকান্ডের মূলে কাজ করে এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদ। যদি অভাব পূরণের উপকরণ গুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প না হত, আর চাহিবা মাত্রই যদি সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করা সম্ভব হত এবং মানুষের সকল চাহিদার নিবৃত্তি ঘটত তাহলে মানব জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি হত না; আর অর্থ শাস্ত্রের উদ্ভবও ঘটত না। ইসলাম এই সত্যকে অস্বীকার করে না। তবে এই প্রয়োজন ও চাহিদাকে ইসলাম অপরিহার্যতার গন্ডিতে সীমিত করে দেয়। চাহিদাকে বল্গাহীন করে দিয়ে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে তা পূরণের চেষ্টাকে ইসলাম ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বলে মনে করে। তাই নির্দিষ্ট কতিপয় বিধি-বিধানের আওতায় ইসলাম মানুষের জীবনের প্রয়োজনকে সীমিত করে দিয়েছে। আর সীমিত সম্পদ দিয়ে সেই সীমিত প্রয়োজনকে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা হওয়া উচিত নিম্নরূপঃ

'জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন সমূহকে নিরূপণ এবং তা পূরণের জন্য খোদা প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের শরীয়ত সম্মত বৈধ পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ সহকারে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে'।

ইসলামি অর্থনীতি:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী বিধি-বিধান কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশোধ কিংবা প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক নয়। বরং নাম ও তাৎপর্যগত উভয়দিক থেকেই ইসলাম মানব সমাজের জন্য একটি কল্যাণকর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শ।

তাই তার অর্থায়ন পদ্ধতিতেও নিন্দিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন অবকাশ নেই তদ্রূপ সমাজতন্ত্রের শোষনমূলক অর্থব্যবস্থারও কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির আদর্শিক রূপ হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা পদ্ধতিতেও সমকালীন বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণ অর্থায়নের অনুমতি দিয়েছেন।

আল্লহর দেওয়া শরয়ী ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামি অর্থায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতা। আর বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে আধুনিক যুগের পারস্পারিক অর্থায়ন সহযোগিতার উন্নত পদ্ধতি। ইসলাম পারস্পারিক সহযোগিতামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি।

সুদের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে। ব্যাংক নিশ্চয়ই কল্যাণকর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত সূদভীত্তিক ব্যাংক হলো পুঁজিপতিদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়। কারণ এটা হলো সম্পদ বাড়ানোর ও সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং গরীবদের শবদেহের উপর পুঁজির গগনচুম্বি অট্টালিকা তৈরি করার উত্তম হাতিয়ার। তবে অর্থায়ন পদ্ধতির যে চিত্র ইসলাম পেশ করেছে তা পৃথিবীতে যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক অঙ্গনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরীয়াহ মুতাবেক পরিচালনা করার লক্ষ্যে সেগুলোতে সংস্কার সাধন করা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত এমন এক পরিবেশে যার গোটা অর্থ ব্যবস্থা সুদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সে পরিবেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সূদ বিহীন (Interest-Free) ভিত্তির উপর পুনর্গঠন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

যেসব লোক শরীয়তের মূলনীতি, আদর্শ এবং তার অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নন, তারা কখনও কখনও মনে করে থাকেন যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে না বরং সেগুলো সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যার উদ্দেশ্য হবে বিনা লাভে আর্থিক সেবা প্রদান করা।

প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদবিহীন ঋণ একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের জন্য; ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নয়। বরং তা পারস্পারিক সহযোগিতা এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য হয়ে থাকে। তবে যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে

পুঁজি সরবরাহের প্রশ্ন জড়িত সেখানে ইসলামী শরীয়তের নিজস্ব এক স্বয়ংসম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা বা নীতিমালা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি অপরকে ঋণ প্রদান করছেন তাকে প্রথমে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি কি এ ঋণ দ্বারা শুধু দ্বিতীয় পক্ষকে সাহায্য করতে চান, নাকি তার মুনাফায় অংশীদার হতে চান? যদি তিনি এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে কেবল সাহায্য করতে চান তাহলে ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত দাবী করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার মূল পুঁজি নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষতি বা লোকসান হলেও ঋণদাতার মূলধন ফেরৎ পাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে)। কিন্তু মূল পুঁজির অতিরিক্ত কোন মুনাফার হকদার তিনি হবেন না। আর তিনি যদি অন্যকে এই উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করেন যে, তার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফায় অংশ নিবেন এমতাবস্থায় তিনি অর্জিত মুনাফায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুপাতিক হারে মুনাফা দাবী করতে পারবেন। তবে, এ ক্ষেত্রে যদি লোকসান হয়ে যায় তাহলে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় বহন করতে হবে।

সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুদের পরিসমাপ্তির অর্থ এই নয় যে, পুঁজির যোগানদাতা কোন মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। বরং যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুঁজির যোগান দেওয়া হয়, তাহলে লাভ- লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এ জন্যই ইসলামী বাণিজ্য আইনের শুরুতেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যে সকল ক্ষেত্রে কোনভাবেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য সমকালীন আলিমগণ অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়াও উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলো অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা'।

বিগত দু'দশক যাবৎ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়নের ইসলামী পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে তা পরিপূর্ণভাবে সুদী অর্থায়নের বিকল্প নয়। আবার এ ধারনাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ হুবহু সুদী অর্থায়ন পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার করা যায়। বরং ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, দর্শন এবং শর্তাবলী। যেগুলো ব্যতীত সে পদ্ধতিসমূহকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামী অর্থায়নকে সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়নের সাথে খলত-মলত ও জগাখিচুড়ি করে ফেলার কারণ হতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদ:

বর্তমান পৃথিবীতে মোট ৪টি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যথাঃ

১. ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

২. সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

বস্তুতঃ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ৪টি প্রশ্ন খুবই জটিল। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই মূলতঃ সেই ৪টি জটিল প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করা। অবশ্য সমাধানের থিউরী প্রত্যেক মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন। সেই ৪টি প্রশ্ন সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. অভাব নির্বাচনের প্রশ্ন: মানুষের অসংখ্য চাহিদার মাঝে কোন গুলোকে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে তা নির্বাচন করাকে বলা হয় অভাবের নির্বাচন। তবে এই নির্বাচন কি ভাবে করা হবে, এবং কিসের ভিত্তিতে তা করা হবে সেটিই মূলতঃ এক্ষেত্রের মৌলিক সমস্যা। এ প্রশ্নটি যেমন ব্যক্তির বেলায় রয়েছে, তা রাষ্ট্রের বেলাও রয়েছে। আর সেই অভাব পূরণের জন্য উৎপাদন-উপকরণ কোন ক্ষেত্রে কতটুকু কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে, কোন বিষয়ের উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এগুলোও এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার আওতাভূক্ত।

২. উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রশ্ন: অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ কিংবা মানুষ্য সৃষ্ট উৎপাদন-উপকরণ সমূহ; যেমন- ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, কোন উৎপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগের প্রক্রিয়া কি হবে এটিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বড় প্রশ্ন।

৩. উৎপাদিত পণ্য ও লভ্যাংশ ভোগ বন্টনের প্রক্রিয়ার প্রশ্ন: অর্থাৎ অভাব নির্বাচনের পর উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা সমাজের মানুষের কাছে কিভাবে বন্টন করা হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যে লভ্যাংশ অর্জিত হবে তা সমাজের মানুষের মাঝে কি ভাবে বন্টিত হবে, কে তা ভোগ করবে এবং কোন নীতির আওতায় তা ভোগ করবে, এটিও মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের অন্যতম জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন বটে।

৪. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের প্রক্রিয়া জনিত প্রশ্ন: অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে? কোন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন করলে অধিক হারে লাভবান হওয়া যাবে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই এ প্রশ্নগুলোর সমাধান করার নিমিত্ত প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১. ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

এমতবাদ অনুসারে অর্থ ব্যবস্থাকে সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত করতে হলে এবং উপরোক্ত সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। তাহলে মানুষ অধিক মুনাফা ও প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করতে অনুপ্রাণিত হবে। যদি এটা করা হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরোক্ত চারটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে একটি সুশৃঙ্খল ও গতিশীল পরিস্থিতি ফিরে আসবে। তাদের মতে ব্যক্তি মালিকানার অবাধ অধিকার দেওয়া হলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় সব কিছুই আপনা আপনি হতে থাকবে। রাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না। কেননা উদ্যোক্তারা বাজারে যে বস্তুর চাহিদা দেখাবে তাই তারা উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে। কারণ তাদের লাভ প্রয়োজন। সে জন্য উৎপাদনের যে উপকরণ যে পরিমাণ ব্যবহার করলে এবং যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে লাভ বেশী হবে তাই তারা ব্যবহার করবে। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা যেখানে বেশী হবে সেখানেই তারা সরবরাহ করবে। আর উৎপাদিত পণ্যের আধিক্য সৃষ্টি হলে আপনা আপনিই তার বাজারদর কমে আসবে। যে পণ্যের চাহিদা থাকবে না সে পণ্য কেউ উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে না। আর লাভ ও মুনাফা বন্টনের কাজটিও একই প্রক্রিয়ায় আঞ্জাম পাবে এবং একই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সমৃদ্ধিও অর্জিত হবে। পুঁজিবাদীরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতিও চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কেননা প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অধিক দামে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হলে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়োজন। আবার নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করতে পারলেও অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

অতএব উদ্যোক্তারা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের গুণগতমান বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন উপকরণ ও মেশিনারী উৎপাদিত হবে। ফলে উৎপাদিত পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ক্রমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। সার কথা, পুঁজিবাদীদের মূল বক্তব্য হল 'অবাধ ব্যক্তি মালিকানা'

অর্থাৎ যদি ব্যক্তি উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বাজারজাত করণ এবং লভ্যাংশ ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ মালিকানা লাভকরে এবং সে তার ইচ্ছামত সব কিছু করতে পারে আর রাষ্ট্র যদি এ সকল ক্ষেত্রে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও সমাজের প্রয়োজন পূরণের সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও তরান্বিত হবে।

২. সমাজতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কেননা এদুটি বিষয় মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন বুঝে সে নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাই রাখে না। বলতে গেলে মানুষের ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে অন্ধ। সুতরাং চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা খুবই দুরূহ ব্যপার হবে। আর হলেও তার জন্য বহু অর্থনৈতিক খেশারত দিতে হবে এবং বহু জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে। কারণ চাহিদা ও যোগান কোন বৈদ্যুতিক সুইচ তো নয় যে, টিপলেই চাহিদা সৃষ্টি হবে আর বন্ধ করলেই চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় চাহিদা ও যোগান। ভারসাম্য পূর্ণ হয়ে উঠতে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আবার অনেক সম্পদের অপচয় হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। যেমনঃ এক জায়গায় কোন এক পণ্যের চাহিদা দেখে অনেকেই সে পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

উৎপাদনের উপকরণ বিনিয়োগ করে উৎপাদনের কাজ শুরু করল। কিন্তু কতিপয় উদ্যোক্তা আগে পণ্য সরবরাহ করে বাজারের চাহিদা পূরণ করে ফেলল। ফলে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার কারণে তা গুদামজাত করে রাখা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। অথচ এই পণ্য উৎপাদন করতে যেয়ে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হল তা দিয়ে অন্য একটি প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা যেত। কিন্তু যেহেতু উপকরণ এখানে আবদ্ধ হয়ে রইল; তাই তাদ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হল না।

তাই যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণ রাখতে হবে রাষ্ট্রের দায়িত্বে। রাষ্ট্রই নাগরিকদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে উৎপাদনের প্রক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করে রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মহল এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। অতঃপর যাবতীয় কাজ-কর্ম ও উৎপাদন সেই পরিকল্পনা মাফিক আঞ্জাম দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করবে, উপকরণ যোগান দিবে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হবে, পণ্যের দাম রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে, এমন কি ভোক্তাদের ভোগের পরিমাণও রাষ্ট্র নির্ধারণ

করে দিবে। আর যেহেতু, উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে সুতরাং নাগরিকদের হাতে শ্রম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। রাষ্ট্র নাগরিকদের যোগ্যতা ও শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করবে। যেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন থাকছে না; অতএব এ ব্যবস্থায় উৎপাদন খরচের সমপরিমান মূল্যে দ্রব্য বাজারজাত করা সম্ভব হবে। যাবতীয় মূলধন যেহেতু রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সুতরাং সুদের প্রশ্নও থাকবে না। ভূমিও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে বিধায় ভূমির কেরায়া বা ভাড়া দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে যদি কিছু লাভদাড়ায়; তাহলে তা পারিশ্রমিকের পার্সেন্টিস-এর ভিত্তিতে বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক রূপে নাগরিকদের মাঝে বন্টিত হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থায় দেশের সকল নাগরিক সমান হারে সম্পদ ভোগ করতে পারবে। এতে করে সকল মানুষ মানুষ হিসাবে যেমন সমান; তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার কারণে অসহায় মানুষের যে দুর্বিসহ জীবন যাপণ করতে হয়, এ ব্যবস্থায় তা আর থাকবে না। খেলে সবাই খাবে, না খেলে কেউ নয়। তাছাড়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় মানুষ যেমন বিভিন্নমুখী দুর্নীতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; তাও এ ব্যবস্থায় থাকবে না। কেননা এ ব্যবস্থায় শুধু মাত্র উৎপাদন খরচে দ্রব্য বাজারজাত করা হবে। তাই পুঁজীবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত ব্যয় যেমন- ভূমির ভাড়া, ব্যাংকের সূদ, উদ্যোক্তার লাভ ইত্যাদি সংযোজন করে দ্রব্যের যে Surplus Value বা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে বাজারজাত করা হয় এই ব্যবস্থায় তারও প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পণ্য ক্রয় করতে যেয়ে দরদাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে যে প্রতারণা ও হয়রানীর শিকার হতে হয়; এব্যবস্থায় তাও থাকবে না। কারণ উৎপাদন ব্যয়ের সমপরিমাণ মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে। আর যেহেতু এব্যবস্থায় পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের দায়িতে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকছে না; তাই তাদ্বারা কোন ধরণের ভেজাল, প্রতারণা, মাপে কম দেওয়া, দর-দামের ক্ষেত্রে অধিক মূল্য হাকার মত কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও থাকবে না। সুতরাং এব্যবস্থায় মানুষ নিঃশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে সুস্থ্য পরিবেশে সমতা রক্ষা করে জীবন যাপণ করতে পারবে।

৩. মিশ্র অর্থনীতি

মিশ্র অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক বিষয় তাই এটিকে অকার্যকর করে দেওয়া যায় না। আবার অবাধ মালিকানা লাভ করলে ব্যবসায়ীরা এক চেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে ফেলে এবং ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করে আপসে শলাপরামর্শ করে দ্রব্যের মূল্য চড়িয়ে দেয়। এজন্য সকল ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। তা ছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান- যা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে উদ্যোক্তাদেরকে পুঁজির বৃহদাংশ উচ্চ সুদে ঋণ করে যোগান দিতে হয় এ ধরণের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং

জরুরী নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পের উৎপাদনের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী পণ্যে সংকট সৃষ্টি করেই ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মুনাফা হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তাই যদি বেসরকারী ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার থাকে তাহলে মানুষ সর্বোচ্চ হারে তার মেধা ও শ্রমকে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যয় করতে উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে। আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং বৃহৎ ও জরুরী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে জনগণকে প্রতারিত করার এবং যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে জনগণকে হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করার সুযোগ থাকবে না। এদের সার কথা হল নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা প্রদান করা হবে তবে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের নিরসন সহজ হবে।

৪. ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী অর্থনীতি মনে করে মানুষের উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ব্যাক্তি মালিকানাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা ব্যক্তি মালিকানা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার একটি। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ যা নিজের মনে করে তার প্রতি যত্নবান হয়, সংরক্ষণ করে এবং তাতে প্রবৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। তা ছাড়া যা নিজের মনে করে তার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করতে ও শ্রম দিতে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সম্মত হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে মানুষ এমন শ্রম দেয় ও কষ্ট করে যার জন্য স্বাভাবিক পর্যায়ের শ্রম দিতে বা কষ্ট করতেও সম্মত হয় না। অতিরিক্ত শ্রম দেওয়া বা কষ্ট স্বীকার করার তো প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাবার স্বার্থেই ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন : ইরশাদ হয়েছে-

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবনোপকরণকে তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এবং কতিপয়ের উপর কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি যাতে করে একজন আরেক জনকে কাজে লাগাতেপারে।-(সূরা যুখরুফ: ৩২)

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

পুরুষরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে আর রমনীরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে। (সূরাঃ ৪: ৩২)

ومما رزقنا هم ينفقون

আমি যে জীবনোপকরণ তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যায় করে।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের ভাষ্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে এই ব্যক্তি মালিকানা যাতে অর্থনৈতিক আবর্তনে কোন জটিলতা সৃষ্টি না করে, সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে যায় এবং ব্যক্তির সঞ্চয় যাতে সমষ্টি জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে এ জন্য ইসলাম আয় উপার্জন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। সম্পদ গুদাম জাত করা নিষিদ্ধ হওয়া, সুদী কারবার ও লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়া, জুয়া, হাউজী, লটারী নিষিদ্ধ হওয়া, পণ্যহীন বেচাকেনা অবৈধ হওয়া, এক কথায় সকল প্রকার ফাসিদ ও বাতিল বেচা-কেনাকে এজন্যই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায় প্রতারণা ও ধোঁকার যাবতীয় পন্থা ও প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এ সকল পন্থা অবলম্বন করেই পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে।

অর্থাৎ ইসলাম একদিকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তিকে পূজি, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে- যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। আবার আইনগত বৈধতা ও অবৈধতার সাথে হালাল হারামের বিধানকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে সেই অধিকারকে সীমিত করে দিয়েছে।

চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধানকেও ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। বলা যায় যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর যাতে পুঁজিবাদের অশুভ অবস্থার সৃষ্টি না হয় সে জন্য তিন ধরণের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১. দ্বীনী প্রতিরোধ: অর্থাৎ ব্যক্তি অবাধ মালিকানার অধিকার লাভ করার পরও তাকে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকেই আয়-উপার্জন করতে হবে-এই ঘোষণা ইসলাম দিয়ে রেখেছে। ফলতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে ব্যক্তিকে সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা ও সকল প্রকার হারাম লেনদেন পরিহার করে চলতে হয়, অথচ ঐসব লেনদেনের মাধ্যমেই ব্যক্তি রাতারাতি পুঁজিপতি বনে যায়।

২. রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ: ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার ব্যবস্থার উপর যদিও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয় না কিন্তু যদি কেউ বাজার ব্যবস্থার উপর দখলদারিত্ব সৃষ্টি করতে চায় কিংবা যদি স্বাভাবিক বাজার দরে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার ইসলাম রাষ্ট্রকে দিয়েছে।

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এর সুস্পস্ট আভাস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন-

من دخل في شيئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقذفه في معظم من النار ورأسه اسفله - اخرجه الحاكم و بيهقى واحمد

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বাজারদর চড়িয়ে দেওয়ার মানসে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করবে, তাকে মাথা নিচ দিকে দিয়ে কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহর রয়েছে।

একবার হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতা (রা.) স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে কম দামে কোন দ্রব্য বিক্রি করছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন- اما أن تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا - اخرجه مالك وعيد ابن حميد والبيهقي হয়ত তুমি তোমার দ্রব্যের দাম বাড়াবে, না হয় তুমি আমাদের বাজার থেকে উঠে যাবে।

এ হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে দাম ব্যবস্থায় কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে।

৩. নৈতিক প্রতিরোধ: অর্থাৎ ইমলাম মানুষের মাঝে সহানুভূতি, সহমর্মীতা ও সদাচারের অনুভূতি সৃষ্টি করতে চেষ্ট করেছে এবং নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের উপকার করার চেতনা সৃষ্টি করেছে। ইরশাদ হয়েছে-

يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة.

দানশীলতায় অগ্রগামী হওয়ার অনুপ্রেরনা দিয়েছে, দুনিয়ার লোভ লালসা ভোগ বিলাস থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে, কৃপণতাকে জঘন্য মনোবৃত্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। সর্বোপরি ইসলাম মানুষকে এমন একটি চেতনার উপর গড়ে তুলতে চেয়েছে যাতে সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে মানুষের জীবনের মৌলিক লক্ষ্য। সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি বরং তাওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলে পরকালের সফলতা অর্জনকে জীবনের পরমলক্ষ্য হিসাবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সার কথা:

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض. তুমি কি জান না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। (বাকার: ১০৭)

যেহেতু সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর, সুতরাং মানুষ কেবল তাদের বৈধ দখলদারিত্বের মাধ্যমে এই সম্পদ ভোগের অধিকার লাভ করতে পারবে।

২. যেহেতু সবকিছুর চুড়ান্ত মালিকানা আল্লাহর, তাই আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে হবে। তাঁর বিধান ডিঙ্গাবার অধিকার নেই কারো।

ولله ميراث السموت والارض والله بما تعملون خبير-

আসমান ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহরই। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন।-(সূরা: আল্-ইমরান: ১৮০)

انا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون

আমিই ভূ-পৃষ্ঠের একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং যা কিছু তার উপর রয়েছে তারও। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন।-(সূরা: মারইয়াম: ৪০)

৩. যেহেতু ইসলাম সমস্ত সম্পদের মূল মালিক আল্লাহকে মনে করে এবং ব্যক্তিকে সেই সম্পদে সাময়িক কালের জন্য আমানতদার মনে করে; এজন্যই একচ্ছত্র ব্যাক্তি মালিকানার বিশ্বাসের ফলে, আমিত্ব ও অহংকারের ন্যায় দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলো ব্যক্তির মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনা এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবনতা জন্মে না।

৪. ইসলামী অর্থনীতিতে বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নতির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে নৈতিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে অর্থ সম্পদ আহরণের বিষয়টিকে মোটেও অনুমোদন দেওয়া হয় না। ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, কালবাজারী, মওজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ, জুলুম, শোষণ ইত্যকার পন্থায় সম্পদ আহরণের অনুমোদন দেওয়া হয় না।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين এই যমীন আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারিত্ব দান করেন। শুভ পরিমাণ তো মুত্তাকীদের জন্যই (অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এসব বর্জন করে তাদের জন্যই)।।

৫. সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় যেহেতু সমাজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোষিত হয় তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কোন রূপ সুদী লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয় না।

৬. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার কারো নেই। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, যাকাত, সাদাকাহ ও সাধারণ জনকল্যাণের নিমিত্তে দান করে দিতে হয় অথবা উৎপাদনে নিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যয় করে দিতে হয়। ফলে সম্পদের স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত থাকে।

৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকে স্বাভাবিক ভাবে কার্যকর রাখা হয়। তবে এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উৎপাদন ও ভাগ-বন্টনের যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়।

৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য অধিক মুনাফা অর্জন নয়। বরং সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণকল্পে হালাল ভোগ্যপন্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির সেবা করা। লভ্যাংশ যা পাওয়া যাবে তাদ্বারাও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সেবা করা। এ দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

نفقتك لنفسك صدقة ولاهلك صدقة

তুমি নিজের জন্য যা ব্যায় করবে তা সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে এবং পরিবার পরিজনের জন্য যা ব্যায় করবে তাও সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

৯. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকে নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট। খাদ্য গ্রহণের পর বর্তনে যা লেগে থাকে সেই পরিমাণ সম্পদও যাতে অপচয় না হয় এজন্য রাসূল (সাঃ) বর্তন চেটে খাওয়াকে সুন্নত বলে ঘোষণা 'দিয়েছেন। যে খাদ্য মাটিতে পড়ে যায় তা কুড়িয়ে খাওয়াকেও সুন্নত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিলাস ও অপচয়ের কোন সমর্থন নেই।

১০. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইহকালীন সমৃদ্ধির সাথে সাথে পরকালীন সাফল্যের দিকটিকে সব সময় বড় করে দেখা হয় এবং পরকালীন সাফল্যকেই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নত করা হয়। আর এই পরকালীন সাফল্য নির্ভর করে স্রষ্টার সন্তুষ্টির উপর। তাই সকল অর্থনৈতিক কর্ম-কান্ডে স্রষ্টার অভিপ্রায়কে সামনে রেখে তার নির্ধারিত বিধান মাফিক সব কিছু আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মানুষ নিজ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়। তাই আইন লঙ্ঘন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বনের প্রবণতা কখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে না। মানুষ নিজস্ব তাড়নায় আইনানুগ জীবন যাপণ করে। এমনকি সম্পদ মানুষের কল্যাণে সাদকাহ করে দিলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ হয় ও তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এই বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ অকাতরে অন্যকে বিলিয়ে দেয়।

পুজিবাদ ও ইসলামি অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য:

ইসলাম বাজারের শক্তি (চাহিদা ও যোগান) এবং বাজার অর্থনীতিকে অস্বীকার করে না। এমনকি ব্যক্তি স্বার্থের চেতনাও একটি যৌক্তিক সীমা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেনি। এতদসত্ত্বেও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা এবং ব্যাক্তি-স্বার্থের চেতনাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে লাগামহীন শক্তি এবং সীমাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং তাদের এ স্বাধীনতাকে কোন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। যদি কোথাও কিছু নিয়ন্ত্রণ থেকেও থাকে তাও স্বয়ং মানুষ কর্তৃক আরোপিত। যা আইন তৈরির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা মুক্ত। আর এ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের ঊর্ধ্বে কারো কর্তৃত্বকে (Authority) স্বীকার করে না। এরূপ ব্যবস্থা এমন বহু কার্যকলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যা সমাজে (অর্থনৈতিক) বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। সুদ, জুয়া এবং লটারী সম্পদকে গুটিকতোক লোকের হাতে পুঞ্জিভূত করে রাখার সুযোগ করে দেয়। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে অশালীন ও ক্ষতিকর দ্রব্য এবং সেবা (Service) আবিষ্কারের মাধ্যমে অসুস্থ মনুষ্য আবেগকে ব্যবহার করা হয়।

ধন-সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন আগ্রহ ও স্পৃহা ইজারাদারী সৃষ্টি করে। ফলে বাজারের ক্ষমতা (চাহিদা ও যোগান) হয়ত স্থবির ও শ্লথ হয়ে যায়। অথবা কমপক্ষে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বাজার-ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবীদার, কার্যত চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কেননা, চাহিদা ও যোগানের এ শক্তি ইজারাদারীতে নয় বরং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অঙ্গনে সঠিকভাবে কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় (Secular Capitalism) অনেক সময় এমনও

হয় যে, কোন বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুভব করা যায় যে, এটি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উপযোগী নয়। এতদসত্ত্বেও একে কেবল এ উদ্দেশ্যে চালু থাকতে দেয়া হয় যে, (একে অচল করে দেয়া) এমন একটি প্রভাবশালী মহলের স্বার্থের পরিপন্থি, যাদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিদ্যমান। যেহেতু (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়) জনগণের শাসনের ঊর্ধ্বে যে কোন কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে এবং Trust in God-এর মূলনীতিকে (যা প্রত্যেক মার্কিন ডলারে লিখিত রয়েছে) সামাজিক, অর্থনৈতিক অঙ্গন থেকে পুরোপুরি হটিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য সে ব্যবস্থায় কোন স্বীকৃত আসমানী হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা নেই, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অপকর্ম ও অশ্লীলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য এ ছাড়া আর কোন পথে নেই যে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মেনে নিয়ে তাঁর বিধি-বিধানের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে এবং সে বিধানাবলীকে এমন যথার্থ মনুষ্য-শক্তির ঊর্ধ্বের হিদায়াত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যার উপর সর্বাবস্থায় যে কোন মূল্যে আমল করা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হবে। মূলত এটাই ইসলামী জীবনব্যবস্থার সারকথা। ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থের চেতনা এবং বাজারের ক্ষমতা মেনে নিয়ে ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছে। এ সকল বিধি নিষেধ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে আরোপিত, যাঁর জ্ঞান অসীম ও অনন্ত, যেহেতু এ বিধি-নিষেধসমূহ মানুষের জ্ঞানলব্ধ গবেষণা দ্বারা হটানো যাবে না। সুদী লেনদেন, জুয়া, গুদামজাতকরণ, কালোবাজারী, অবৈধ পণ্য এবং অবৈধ সেবার লেনদেন, যে পণ্য নিজের মালিকানায় নেই, তার বেচাকেনা (Short Selling) ইত্যাদির নিষিদ্ধতা আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধি নিষেধের কয়েকটি উদাহরণ। এমন বিধি নিষেধ ও নিয়মনীতি সম্মিলিতভাবে অর্থ-ব্যবস্থার উপর একটি সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামঞ্জস্যতা আসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ

রিবা:

আরবী "রিবা" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি, সুদ ইত্যাদি।

ফকীহদের পরিভাষায়, সমজাতীয় কোনো পণ্য বা মুদ্রা পরস্পর বিনিময় হিসেবে কম বেশি করে ক্রয়বিক্রয় করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়।

রিবার প্রকারভেদ:

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রিবা দুই প্রকার। যথা:-

1. ربا النسيئة রিবা আল-নাসিয়া (অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদি ঋণ)।
2. ربا الفضل রিবা আল-ফদ্বল (পণ্য-সামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করা)।

1. ربا النسيئة রিবা আল-নাসিয়্যাহর সংজ্ঞা:

'নাসিয়া' শব্দের অর্থ হলো বিলম্ব বা প্রতীক্ষা।

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেন,এমন ঋণ যাতে মেয়াদ শর্ত করা হয় এবং গ্রহিতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয়। [আহকামু কুরআন ১/৫৫৭)

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়া। একে রিবাল করযও বলা হয়। রিবান নাসিয়্যাহ-এর আরেক প্রকার হল, রিবাদ দাইন।

রিবাদ দাইনের সংজ্ঞা: কারো থেকে কোনো পণ্যের বিক্রিলব্ধ বকেয়া-মূল্য পরিশোধের সময় হলে, তখন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। জাহেলী যুগে রিবা নাসিয়্যাহর উভয় প্রকারের প্রচলন ছিল খুব বেশি।

আজও এই উভয় ধরনের রিবা নাসিয়্যাহ ব্যাংকিং জগতে এবং মার্চেন্টদের সমাজে বহুল প্রচিলিত।

বাজারে বিভিন্ন পণ্য কিস্তিতে বিক্রি হয়। কিন্তু কিস্তি সময় মতো দিতে না পারলে, একটা নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়। এটা রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে টাকা ঋণের মাধ্যমে জাহেলীযুগের লোকেরা সুদ লেনদেন করত। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعْفًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون(١٣٠) َ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।" [সূরা আল ইমরান: ১৩০]

রিবা নাসিয়্যাহ এর প্রচলিত রূপ ও ক্ষেত্রসমূহ:

রিবা নাসিয়্যাহকে রিবাল কুরআন, রিবাল করয বা রিবাদ দাইনও বলা হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ এর জ্বলন্ত উদাহরণ, এছাড়াও আরো ক্ষেত্র আছে, নিম্নে একেকটি করে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল,

১. সুদি ব্যাংক: ব্যাংকের সংজ্ঞাতেই আছে যে, ব্যাংক হল- অল্প সুদে ঋণ নেয়া, আর বেশি সুদে ঋণ দেয়। সুদি ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট ছাড়া সকল প্রকার একাউন্ট সুদি একাউন্ট। তাই সুদি ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট এবং সকল ধরনের ফিক্সড ডিপোজিট সুদি। অনেকে মনে করেন সরকারি হলে সেটা আর সুদি হয় না। অথচ এ ধারণা সম্পূণ ভুল।

এছাড়া কারেন্ট একাউন্টেও ইদানিং সুদের মিশ্রণ দেওয়া হয়। এ ধরনের কারেন্ট একাউন্টকে SND কারেন্ট একাউন্ট বলে। এ সকল একাউন্ট খোলাই সুদি চুক্তির গুনাহ। পরে সুদ গ্রহণ করলে তার গুনাহ ভিন্ন হবে।
সুদি ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট খোলাটাই সুদি চুক্তির গুনাহ। তাই সুদ গ্রহণ না করলেও যেকোনো ধরনের সেভিং একাউন্ট করলে সুদি চুক্তির গুনাহ হবে।

২. ডি.পি.এস/ DPS ডিপোজিট পেনশন স্কীম: এটিও সম্পূর্ণ সুদি একাউন্ট।

৩. সুদি ব্যাংকের যেকোনো লোনই সুদি লোন। যেমন: কার লোন, হোম লোন, হাউজ লোন, ইনভেস্টমেন্ট লোন, সিসি লোন, কৃষি লোন ইত্যাদি।

৪. প্রাইজবন্ড: সরকার প্রাইজবন্ড ছাড়ে। যা যেকোন ব্যাংক থেকে ভঙ্গানো যায়। একটি নির্ধারিত মেয়াদের পর লটারির মাধ্যমে ড্র করা হয়। এরপর বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটাই রিবা নাসিয়্যাহ বা সুদ। প্রাইজবন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। আর ব্যাংক প্রাইজ বা পুরস্কার দেয়ার নামে ক্রেতাকে সুদ দিচ্ছে।

৫. ক্রেডিট কার্ড: ক্রেডিট কার্ড মূলত এক প্রকার সুদ ভিত্তিক লোন কার্ড। কেননা এই কার্ডের চুক্তিপত্রেই লেখা রয়েছে যে, মিনিমাম ডিউ টাইমে/ ডেটে বাকি পরিশোধ না করলে, প্রতিদিন নিদিষ্ট হারে সুদ দিতে হবে। যার ফলে অধিকাংশ ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারই সুদের আওতায়

পরে যান। এই সুদে রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত, যা রিবা নাসিয়্যাহ। তাই সুদ থেকে বাঁচতে হলে, অবশ্যই যথাসময়ে বাকি পরিশোধ করে দিতে হবে। তাহলে আর সুদি কারবার হবে না।

৬. ক্রেডিট কার্ড দ্বারা এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করলে যে চার্জ নেওয়া হয়, তা সুস্পষ্ট সুদ। কেননা কার্ডের ফি তো আলাদা নিচ্ছেই। এখন অতিরিক্তটা ঋণের বিনিময়ে হচ্ছে।

৭. বন্ড: সরকারি ও বেসরকারি বন্ড। এগুলো সম্পূর্ণ রিবা নাসিয়্যাহ। সরকারি হওয়ার কারণে কিংবা নিদিষ্ট কোনো বাণিজ্যিক প্রকল্প, কোনো কোম্পানী বা রাস্তা-ঘাট কিংবা ব্রীজ নির্মাণের জন্য ঋণ নেওয়া হচ্ছে, এমন কথা উল্লেখ করার কারণে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এটা সুদি হবে না, কিন্তু এ ধারণা ভুল। স্টক এক্সচেঞ্জ বা বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য যেকোনো ব্যাংকে যে বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাতে সুনিদিষ্ট সুদের ঘোষণা দেওয়া থাকে। এ সকল বন্ডও সুদি বন্ড।

৮. স্টুডেন্ট লোন: সরকারি ব্যাংক কর্তৃক স্টুডেন্ট লোন দিয়ে যা অতিরিক্ত নেওয়া হয়, সেটাও সুদ। তা ইন্টারেস্ট বা সার্ভিস চার্জ নামেই নেওয়া হোক না কেন।

৯. লটারি: রেডক্রিসেন্ট বা এ জাতীয় সরকার অনুদমোদিত কিছু প্রতিষ্ঠান দশটাকা বিশটাকা মূল্যের লটারি টিকেট ছাড়ে। এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা, গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরস্কার পায় কেবল দু'তিনজন। আর বাকিরা কিছুই পায় না। তাদের মূল টাকাই গচ্চা যায়। এ ধরনের লেনদেনকে শরীয়াতের ভাষায় 'কিমার' বলে। যা সম্পূর্ণ হারাম। আর এক্ষেত্রে সবাই তো অতিরিক্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যেই দশ-বিশ টাকার লটারি ক্রয় করে থাকে। যদিও কেউ পুরস্কার পায়, কেউ পায় না। তাই এতে সুদও বিদ্যমান।

১০. পোস্ট অফিসের সঞ্চয়পত্র: পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সরকারিভাবে বিভিন্ন নামের সঞ্চয়পত্র স্কীম রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সুদি, রিবা নাসিয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

১১. জমি বন্ধক: বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় বহুল প্রচলিত লেনদেন হল, জমি বন্ধকরীতি। জমির মালিক একটা মোটা অংকের টাকা নেয়। বিনময়ে বন্ধক গ্রহীতা জমিটি ভোগ করে এবং মেয়াদান্তে মালিক পুরো টাকা ফেরত দিয়ে জমটি বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার জন্য বন্ধকি জমি ভোগ করা রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। কোনো কোনো এলাকায় এটাকে জমি কট দেওয়াও বলে। আবার কেউ জমি খালাসি দেওয়া বলে। নাম যাই হোক লেনদেন এবং হুকুম একই।

১২. বাড়ি বন্ধক: জমি বন্ধকের মত ঢাকা শহরে বাড়ি বন্ধকের প্রথা চালু হয়েছে। তা হল, বাড়িওয়ালা নিজ প্রয়োজনে ৫ বা ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। বিনিময়ে পাঁচ বছর বা দশ বছর ঋণদাতাকে তার ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগ দেয়। পরবর্তীতে যখন ঋণ পরিশোধ করে দিবে, তখন এই চুক্তি সমাপ্ত হবে। এই লেনদেনও সম্পূণ সুদী ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভক্ত। যা সুস্পষ্ট হারাম। কেননা ঋণের কারণেই এ সুবিধা পাচ্ছে।

১৩. বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি বেশি দিলে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া:
বাড়ি বন্ধকের উপরোক্ত পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার কারণে অনেকে হীলা হিসাবে এ পদ্ধতি চালু করছে। যেমন: কোনো বাড়িওয়ালার টাকার প্রয়োজন। যেখানে সাধারণ হিসেবে অগ্রিম নেওয়ার কথা ২০ হাজার টাকা, কিন্তু এর স্থলে বাড়িওয়ালা প্যাঁচ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি মানি দাবি করে এবং এর বিনিময়ে ভাড়া কমিয়ে দেয় (যেমনঃ সাধারণ হিসেবে ভাড়া যদি হয় ১০ হাজার টাকা এক্ষেত্রে ভাড়া হবে ১/২ হাজার টাকা)-এটাও হারাম। কেননা ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই মূলত তার থেকে ভাড়া কম নিচ্ছে। এই ঋণকে ছুতা হিসেবে সিকিউরিটি মানি বলা হয়েছে। মূলত সিকিউরিটি মানি তো সেটাই, যা সচরাচর সবাই দিয়ে থাকে। যা দিলে ভাড়া কমানো হয় না। ভাড়া স্বাভাবিকই থাকে। নাম যাই দেওয়া হোক, ফিরত যোগ্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই ১০ হাজার টাকার ভাড়া ১/২ হাজারে নেমে এসেছে।

ফাযালা বিন উবাইদ রাহ. বলেন, যেই ঋণ কোনো মুনাফা নিয়ে আসে, তা রিবার প্রকারসমূহের একটি। [সুনানে বাইহাকী: ৫/৩৫০]

ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসাউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বস্তু ঋণ দিবে, সে যেন অতিরিক্ত কোনো কিছু শর্ত না করে। যদিও এক মুঠো ঘাস হোক না কেন।[মুআত্তা মালেক; হাদীস ২৫১৩]

১৪. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড: সরকারি বা বেসরকারি ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদি ফান্ড। ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে এত টাকা জমা দেওয়ার অর্থ ঋণ দিয়ে পরবর্তীতে অতিরিক্ত নেওয়া। আর এটাই রিবা নাসিয়্যাহ। আর পুরো সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বাধ্যতামূলক যে অংশ এই ফান্ডে কেটে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এর সাথে অতিরিক্ত যে অংশ দেওয়া হয় তা সুদ নয়। তা নেওয়া জায়েয। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কেটে রাখার পাশাপাশি ঐচ্ছিকও কিছু কাটানোর সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত অংশ কাটানো সুদী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এই অতিরিক্ত কর্তিত অংশের উপর উদ্বৃত্ত যা দিবে, তা সুদ। তা নেওয়া বৈধ হবে না। তাই বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত উক্ত ফান্ডে জমা রাখাও জায়েয হবে না। কেননা ঐচ্ছিক অংশ রাখার অর্থই হল সুদী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এছাড়া স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সকল টাকা সুদী ব্যাংক বা বীমাতে রেখে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে সেটিই তাদেরকে দেওয়া হয়। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানের ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমার অতিরিক্ত নেওয়া জায়েয হবে না। কেননা সেগুলোও সুদের অন্তর্ভুক্ত।

১৫. লাভের হার নির্ধারণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদানের শর্তে বিনিয়োগ করা: ব্যাংক ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার জন্য টাকা প্রদান করে লাভ হিসেবে নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার শর্ত করা হয়, এটাও সম্পূর্ণ সুদী লেনদেন ও সুদি বিনিয়োগ। ব্যবসার জন্য দেওয়া আর লাভ দেওয়ার কথা হলেই অনেকে মনে করেন তা ইসলামী হয়ে যায়; সুদি থাকে না। অথচ ব্যবসার জন্য টাকা দিয়ে নির্ধারিত অংকের কিছু দেওয়ার চুক্তি বা শর্ত করাই সুদ ও রিবা নাসিয়্যাহ। এক্ষেত্রে হালালভাবে বিনিয়োগ করতে চাইলে, ব্যবসার প্রকৃত লাভের শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে লাভহলে নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী ভাগ পাবে। আর লাভ না হলে পাবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত লেনদেনে লাভ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু দেওয়ার কথা হলে, চুক্তি অনুযায়ী সে তা দিতে বাধ্য থাকে। লাভ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তাকে তা দিতেই হয়। এটাই সুদ। তদ্রুপ কোন কিছু নির্দিষ্ট না করে, এমনিতেই ব্যবসার জন্য কাউকে টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে কথা হয় যে, লাভ হিসেবে প্রতিমাসে কিছু কিছু দিবে। এটাও সুদী চুক্তি এবং রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত।

১৬. জুয়েলারী দোকানে স্বর্ণ বন্ধক রেখে সুদের উপর লোন প্রদান করা হয়। তেমনিভাবে ব্রাক, আশা, গ্রামের মহাজন সুদের ভিত্তিতে লোকদের লোন দিয়ে থাকে। এগুলো সবই রিবা নাসিয়্যাহ।

১৭. ফরম বিক্রির ছুতায় রিবা নাসিয়্যাহ: কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটি মানুষকে সুদবিহীন লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের নিয়ম হল, ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী ফরম ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়; আর ঋণের হার অনুযায়ী ফরমের দাম কম-বেশি হয়।। যেমন: দশ হাজার টাকা ঋণের জন্য পাঁচশত টাকার ফরম ক্রয় করতে হয়। আর বিশ হাজার টাকার জন্য এক হাজার টাকার ফরম ক্রয় করতে হয়। আর নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর তা পরিশোধ না করলে, পরে আবারও আরেকটি ফরম ক্রয় করে পূরণ করতে হয়। বাহ্যিকভাবে, এটি ফরম ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু এর মাধ্যমেই সুদ অগ্রীম আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। এজন্যই ঋণের পরিমাণ বাড়লে ফরমের মূল্যও বাড়তে থাকে। এটা হচ্ছে, রিবা নাসিয়্যাহ গ্রহণের হীলা-বাহানা ও ছুতা অবলম্বন।

১৮. কিস্তি-বিক্রি: বাজারে ফ্রিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী কিস্তিতে বিক্রয় হয়। এই বিক্রয় চুক্তিপত্রের মধ্যেই উল্লেখ থাকে, সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ বাড়বে। এটা রিবাদ দাইন ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের শর্ত সম্পূর্ণ নাজায়েয। আর বাধ্য হয়ে কেউ এ ধরনের শর্তে ক্রয় করলে, নির্ধারিত মেয়াদের ভেতরই কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। নতুবা সুদ দেওয়ার গুনাহ হবে। অতএব এ ধরনের ক্ষেত্রে সুদ থেকে বাঁচতে চাইলে, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে।

১৯. ইনস্টাবাই: Instabuy বিভিন্ন কেম্পানি ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে বিনা সুদে এবং অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া ২/৩ বা ১২ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না করলে, অতিরিক্ত সুদ দিতে হয়। এতে কারবারটি সুদী কারবারে পরিণত হয়ে যায়। তাই ইনস্টাবাই-এর সুবিধা গ্রহণ করলেও যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় কারবার সুদী হয়ে যাবে। অর্থাৎ রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

2. ربا الفضل রিবা আল-ফজ্বলের সংজ্ঞাঃ

এটা পণ্যসামাগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করার সাথে সম্পৃক্ত। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমান পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে, পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমানকে বলা হয়, রিবা আল-ফজ্বল।

আল কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে সুদের হুকুম :

উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সোনার বদলে সোনা, রোপার বদলে রোপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশি না করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও হাত বাঁ হাত অর্থাৎ নগদে বিক্রয় চলবে। যখন ঐ বস্তুগুলোর মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে, তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর।"[সহীহ মুসলিম; ১৫৮৭]

প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, একদা বিলাল রা. রাসূলে করীম সা.- এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল রা. উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই ছা'-এর বিনিময়ে এক ছা' উন্নতমানের 'বারমী' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,'ওহ! এতো নির্ভেজাল সূদ, এতো নির্ভেজাল সূদ। কখনো এরূপ করো

না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহলে নিজর খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নিবে'।

অন্য এক হাদীছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়েয় রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান'।

উল্লেখিত ছয়টি পণ্য কম-বেশি করে পণ্যের বিনিময়ে (একই-জাতীয়) পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করাকে, হাদিসে রিবা বা সুদ বলা হয়েছে। তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। অতএব কুরআন কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের বলা হয়েছে,
প্রথম আয়াতঃ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ◌َ (٥٧٢)

"যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী।" [সূরা বাকারা: ২৭৫]

দ্বিতীয় আয়াতঃ

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِبَوٗا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم٢٧٦ / ◌ٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোসেন না।" [সূরা বাকারা: ২৭৬]

অর্থাৎ, আল্লাহ ত'আলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন। আর সদকা দানকারীর অর্থ-সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٨٧٢ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون٩٧٢) ◌َ

হে মুমিনগণ! তেমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। [সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

পঞ্চম আয়াতঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا الرّبوا أضعفًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون(٠٣١) ◌َ

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আলে ইমরান: ১৩০]

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

সুদ ও ইসলাম:

সুদ যে এক ধ্বংসাত্বক বিষয়, তা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। সুদ প্রদানকারী বাহ্যিকভাবে কিছু সময়ের জন্য লাভবান হলেও ধ্বংসাত্বক এ পাপের কালো ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। এক সময়ে সে নিঃস্ব হয়েই যায়। অপরদিকে দরিদ্র গ্রহণকারী সে আরো দরিদ্র হয়ে যায়।

ইসলামে সুদের অবস্থান ও ভয়াবহতা:

আল্লাহ তাআলা নিজেই সুদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে বলেন, "**আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং সাদাক্বাহ বা দানকে বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না।" [সূরা আল বাকারাহ: ২৭৬**]

একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনও পারে না যে, সে সুদ প্রদান ও গ্রহণ করবে। **আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।" [সূরা আল বাকারাহ: ২৭৮।**

সুদের ভয়াবহতা:

সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَ : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبوا ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ، فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِن رَّبِّهِ فَأَنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ * وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون َ (٥٧٢

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই; অথচ আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা সুদের দিকে আবার ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" [সূরা বাকারা: ২৭৫]

"যদি তোমরা সুদ খাওয়া হতে বিরত না হও, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রেখো।" [সূরা বাকারা: ২৭৯]

নবী করিম সা. বলেন, "এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচার থেকে জঘন্য।" [মিশকাত শরীফ; পৃ.২৪৫]

বর্তমানে সুদের যে বিস্তার লাভ করেছে সুদের কারণে সমাজে যিনা, ব্যভিচার, অন্যায়, অপরাধ বেড়েছে। সুদের দলিল লেখক ও সাক্ষীদের ওপর অভিশম্পাতের কারণ হলো, তারা একটি হারাম ও অবৈধ কাজের সহায়ক হওয়ার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর লানত। সুদকে জেনার চেয়ে জঘন্য বলার আরেকটা কারণ হলো, সুদের কারণে মানুষ আকিদাগত ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। ফলে সে সুদ হারাম হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে হালাল মনে করে। আর হারামকে হালাল মনে করার পরিণতি হলো কুফুরি সমতুল্য, যা ক্ষমার অযোগ্য। এ কারণেই সুদকে জেনার চেয়ে জঘন্য বলা হয়েছে।

হযরতে আবু হুরায়রা র. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, সুদের গোনাহের ৭০টি অংশ রয়েছে। এর ক্ষুদ্রতম অংশ এই পরিমাণ যে, কোনো ব্যক্তি যেন স্বীয় মায়ের সঙ্গে সহবাস করল। نعوذ بالله من ذلك

সুদের গুনাহ নিজের মায়ের সাথে যিনা করার চাইতেও সত্তর গুণ বেশী।
(ইবনে মাজাহ)

সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বাহ্যত অধিক অনুভূত হয়। কিন্তু যেহেতু কল্যাণের কোনো অংশই তাতে বিদ্যমান থাকে না, তাই এর পরিণতিতে সেই মাল এমনভাবে ধ্বংস ও বিনাশ সাধিত হয় যে, তার নামচিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। এ কথাটি শুধু একটি সতর্ক বাণীই নয়, বরং এর বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতাকে কুরআনুল কারিমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ * وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ٢٧٦]

"আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না।" [সূরা বাকারা: ২৭৬]

তাফসীর:

(১) আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান-সদকা উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভযের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

সুদখোরের ধন-সম্পদ আখেরাতে তার কোনোই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-সদকাকারীদের ধন-সম্পদ আখেরাতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

সাধারণ তাফসীরকারগণ বলেন, সুদকে মেটানো এবং দান-সদকাকে বাড়ানো আখেরাতে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়।

মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি আখেরাতের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিস্কার; সত্য উপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি, "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"।[মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৯৫)

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফের গোনাহগারকে পছন্দ করেন না"। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহগার ও পাপাচারী। [মাআরিফুল কুরআন]

এরূপ অভিশপ্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জাবের রা. হতে বর্ণিত,

أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء

"সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং স্বাক্ষীদ্বয়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তারা সকলেই সমান (গুনাহগার)।"[সহীহ মুসলিম, হাদীস ন. ১৯৯৫, শামেলা।]

নবীজি (সা.) লানত ও অভিশম্পাত করেছেন, যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদের দলিল লেখে এবং যে দুজন লোক সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসুলল্লাহ সা. এটাও বলেছেন, গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে তারা সকলেই সমান। [মুসলিম শরিফ]

অতএব আমাদের সকলেরই উচিত জীবনের দরিদ্রতাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা এবং মহান আল্লাহর কাছে স্বচ্ছলতা কামনার সাথে সাথে এও প্রার্থনা করা যেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সুদ বর্জনের তাওফিক দান করেন। (আমিন)

জাহেলী যুগের রিবা:

জাহেলী যুগে যে সমস্ত লেন-দেনের ক্ষেত্রে 'রিবা' শব্দটির ব্যবহার হতো হাদীসে তার বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

কাতাদাহ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ: এক ব্যক্তি অন্যজনের হাতে কোনো জিনিস বিক্রি করতো এবং মূল্য আদায় করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট সময় দিতো। এ সময় অতিক্রান্তের পর যদি সে মূল্য আদায় না করতো, তাহলে তাকে আরো সময় দিতো এবং মূল্য বাড়িয়ে দিতো।

মুজাহিদ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ: এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশী দেবো। (ইবনে জরীর, ৩য় খন্ড, ৬২ পৃঃ)

আবু বকর জাস্সাস তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো। তাতে বলা হতো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে। (আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড)

এ ব্যাপারে ইমাম রাযীর অনুসন্ধান হচ্ছে, জাহেলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিতো এবং তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হতো। যদি সে আদায় করতে না পারতো তাহলে আরো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হতো এবং সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে কবীর, ২য় খন্ড, ৩৫১ পৃঃ)

তদানিন্তন আরবে প্রচলিত এ ধরনের লেন-দেনকে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নাম দিয়েছিল এবং কুরআন মজীদ একেই হারাম ঘোষণা করেছিল।

ব্যবসা ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য :

ব্যবসা বলতে বুঝায়, সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'টি পক্ষ আছে। বিক্রেতা একটি বস্তু বিক্রির জন্য পেশ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে এ বস্তুটির একটি মূল্য স্থির করে। এ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা বস্তুটি কিনে নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে বিক্রেতা নিজে পরিশ্রম করে ও অর্থ ব্যয় করে ঐ বস্তুটি তৈরী করেছে অথবা সে কোথাও থেকে বস্তুটি কিনে এনেছে-এ দুটোর যে কোনো একটি অবস্থার অবশ্যি সৃষ্টি হয়। এ উভয় অবস্থায়ই সে বস্তুটি কেনা বা সংগ্রহ করার ব্যাপারে নিজের যে মূলধন খাটিয়েছে তার সাথে নিজের পরিশ্রমের অধিকার সংযুক্ত করে এবং এটিই তার মুনাফা।

অন্যদিকে রিবা বলতে বুঝায়, এক ব্যক্তি নিজের মূলধন অন্য একজনকে ঋণ দেয়। সাথে শর্ত আরোপ করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতাকে মূলধনের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে মূলধনের বিনিময়ে মূলধন এবং নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশের বিনিময়ে বাড়তি অর্থ লাভ করা হয়-পূর্বাহ্নে একটি শর্ত হিসেবে যেটিকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এ বাড়তি অর্থের নাম সুদ বা রিবা। এটি কোনো বিশেষ অর্থ বা বস্তুর বিনিময় নয়, বরং নিছক অবকাশের বিনিময়। যদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত হবার পর ক্রেতার নিকট শর্ত পেশ করা হয় যে, মূল্য আদায় করতে (মনে করুন) এক মাস দেরী হলে মূল্য একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে যাবে, তাহলে এ বৃদ্ধি সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে।
কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে মূলধনের উপর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলা হয়। সুদের সংজ্ঞা এভাবেই নিরূপিত হয়। তিনটি অংশের একত্র সংযোজনই সুদের উদ্ভব।
এক. মূলধন বৃদ্ধি।

দুই. সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ।
তিন. এগুলোকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।
ঋণ সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেনের মধ্যে এ তিনটি অংশ পাওয়া গেলে তা সুদী লেনদেনে পরিণত হয়। কোনো সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজে লাগানো অথবা কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এ ঋণ গৃহীত হোক এবং ঋণগ্রহীতা দরিদ্র বা ধনী যাই হোক না কেন তাতে এর আসল চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না।

ব্যবসা ও সূদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য নিম্নরূপঃ

এক: ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয় সমান পর্যায়ে। কারণ ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে যে বস্তুটি ক্রয় করে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা ঐ বস্তুটি ক্রেতার জন্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার পারিশ্রমিকই সে লাভ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনে সমান পর্যায়ে মুনাফা বিনিময় হয় না। সুদগ্রহীতা ধনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ লাভ করে, যা তার জন্যে অবশ্যি লাভজনক হয়। কিন্তু সুদদাতা কেবলমাত্র সাময়িক অবকাশ লাভকরে, এর লাভজনক হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সাময়িক অবকাশ তার জন্য লাভজনক হয় না বরং নিশ্চিত ক্ষতিকর হয়। আর ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী বা কৃষিতে খাটাবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে অবকাশ তার জন্য একদিকে যেমন লাভের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয়, তেমনি অন্যদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়েও উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ লোকসান যাই হোক না কেন ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুদী কারবারে এক পক্ষের লাভ ও অন্য পক্ষের লোকসান হয় অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট লাভ এবং অন্যপক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভ হয়।

দুই: ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যত বেশী মুনাফা অর্জন করুক না কেন মাত্র একবারই সে তা অর্জন করে। কিন্তু সুদী কারবারে মূলধন দানকারী অনবরত নিজের ধনের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে থাকে এবং সময় অতিক্রান্তের সাথে সাথে এ মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। তার ধন থেকে ঋণগ্রহীতা যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ মূলধনের বিনিময়ে ঋণদাতা যে মুনাফা অর্জন করে তার কোনো সীমা নেই। তার এ সীমাহীন মুনাফা তার সমস্ত উপার্জন, সমস্ত উপায় উপকরণ ও ধনদৌলত এবং তার যাবতীয় প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যাবার পরও শেষ নাও হতে পারে।

তিন: ব্যবসায়ে পণ্য ও তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই কারবার শেষ হয় যায়। এর পরে ক্রেতা কোনো পণ্য বা বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেয় না। কিন্তু সুদী কারবারে ঋণগ্রহীতা

মূলধন গ্রহণ করার পর তা ব্যয় করে ফেলে; অতঃপর এ ব্যয়িত বস্তু, পুনর্বার সংগ্রহ করে, তার সাথে সুদের বাড়তি অংশ সংযুক্ত করে, তাকে ফেরত পাঠাতে হয়।

চার: ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও কারিগরীতে মানুষ পরিশ্রম করে ও বুদ্ধি খাটিয়ে তার ফল লাভ করে। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন খাটিয়ে কোনো প্রকার পরিশ্রম না করে, চিন্তা ও বুদ্ধি শক্তি ব্যবহার না করে, অন্যের উপার্জনের সিংহভাগ দখল করে বসে। পারিভাষিক অর্থে যাকে অংশীদার বলা হয়, যে ব্যক্তি লাভ-লোকসান উভয়তেই অংশীদার থাকে এবং লাভের আনুপাতিক হারে তা থেকে অংশ নেয়, সে তেমন ধরনের অংশীদার নয়; বরং সে হয় এমন একজন অংশীদার, যে লাভ-লোকসান এবং লাভের আনুপাতিক হারের পরোয়া না করে, নিজের নির্ধারিত ও শর্তাবদ্ধ মুনাফার দাবীদার হয়।

রিবা হারাম হবার কারণ:

ইসলামী অর্থনীতিতে দুর্নীতির অবসান ও জুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি হানা হয়েছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ত কারবার ও লেনদেন চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্-কুরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا . ط

অর্থ: আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।-(সূরা আল বাকারাহ:২৭৫)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুত: সুদের মতো সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দু'টি নেই। সুদের কুফলগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

প্রথমত: সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে

হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জনে ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদানই থাকে না।

দ্বিতীয়ত: সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরও ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীগত বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ সাহায্যের আর কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ অনুৎপাদী ও উৎপাদনী দু'রকম কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনী কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও ঋণ বিনা সুদে মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদের টাকা শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে পেয়ে উত্তমর্ণ আরও ধনী হয়। একই সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিদ্বেষ ও নানা অসামাজিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপরন্তু আধুনিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কল্যাণে ছোট ছোট সঞ্চয় একত্রীভূত হওয়ার সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। এটাকেই এখন এদেশে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে 'মুনাফা' বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তৃতীয়ত: সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকরা
ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়, সরকারের কৃষি ব্যাংক হতেও নেয়। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়ই অনিশ্চিত। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হবে। তা না পারলে কি মহাজন, কি ব্যাংক-সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে কৃষকের সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। এভাবেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিপতি দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন চাষী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

চতুর্থত: সুদের পরোক্ষ ফল হিসেবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ঋণ পেতে পারে, ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক

প্রতিষ্ঠান হতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরও বড় হয়। ফুলে ফেঁপে বেড়ে ওঠে। আর ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, পুঁজিপতি ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজার একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়।

পঞ্চমত: সুদের ফলেই পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। তাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা সুদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণী বিনাশ্রমে এর সাহায্যে উপার্জন করতে পারবে। উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ উপার্জন করলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। এজন্যে এদের মধ্যে অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়।

ষষ্ঠত: সুদের জন্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহণ খরচ, শুল্ক (যদি থাকে) এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে দ্রব্যের বা পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চারবার পর্যন্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সুদ যোগ হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের জন্যে বিদেশ হতে তুলা আমদানীর জন্যে আমদানীকারকদের কাছ হতে ব্যাংক দেয় ঋণের জন্যে যে সুদ নেয় তা যুক্ত হয় তুলার উপর। ঐ তুলা থেকে সূতা তৈরীর জন্যে কারখানা যে ঋণ নেয় ব্যাংক হতে তার সুদ যুক্ত হয় সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হতে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা ব্যক্তি যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের পাইকারী বিক্রেতা তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এইভাবে চারটি স্তরে বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহু গুণ বেশী দাম দিয়ে থাকে।

এমনিভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরূপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ,
সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ সুদবিহীন অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুলুম হতে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ই কম হতো না, জীবন যাপনের মান হতো আরো উন্নত।

সপ্তমত: সুদের কারণেই অর্থনীতিতে ব্যবসায়-চক্রের (Business Cycle) সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে বার বার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে যার ফলে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যে কোন অর্থনীতির জন্যে এ অতি মারাত্মক। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা যদি হিসেব করে দেখে যে অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা খুব কম তখন তারা ঋণ নেয়া বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে। পরিণামে উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়। ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এই সময়ে ব্যাংক যখন দেখে যে, পুঁজির চাহিদা খুব কমে গেছে তখন ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নতুন করে ঋণ নিয়ে পুনরায় উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বার বার মন্দা ও তেজীর সৃষ্টি অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করে সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তরাও একমত।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কত মারাত্মক ক্ষতিকর। সুদের যেসব অপকার বা ক্ষতিকর দিক আলোচনা করা হলো সেসব ছাড়াও আরও ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়,সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক।

সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা ও বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মের্নাড কীনস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The General Theory of Employment, Interest and Money"-তে সপ্রমাণ করেছেন যে, সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ না নিলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সুদই হচ্ছে অর্থ বন্টনের অসমতার

কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। সুদের জন্যেই বরং মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে।

যে কোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সুদের উচ্চহারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সুদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। এসব হতে বুঝতে কারো বাকি থাকে না যে, সুদ সত্যি সত্যি অর্থনৈতিক সাম্যেরই শুধু বিরোধী না অগ্রগতিরও বিরোধী।

অতএব, অর্থনীতি সুদবিহীন হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণ বণ্টন ঘটবে। তাছাড়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ও সব ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইসলাম সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। আব্বাসীয় খিলাফতের পরবর্তী সময়েও মুসলিম জাহানে এ নির্দেশ মেনে চলা হয়েছে। দীর্ঘ নয় শত বছরেরও বেশী বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে সুদবিহীন অর্থনীতি চালু ছিল। তার ফলে সে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছিল অবিশ্বাস্য রকম।

সুদের বিপরীতে করযে হাসানা ও মুদারাবা ছাড়াও মুশারাকা, বাই-ই সালাম, বায়-ই মুয়াজ্জাল, ইজারা, কেরায়া, মুরাবাহা, মুজারাআত, শুকাক্কাত, ইসতিসনা, শিরকাতুল মিলক প্রভৃতি নানা শরীয়াহসম্মত পদ্ধতির তখন উদ্ভব হয়েছিল। আজকের ইসলামী ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট হাউস এসব পদ্ধতিই ব্যবহার করে চলেছে সাফল্যের সাথে।

আজও সেই একই নির্দেশ মান্য করে সফলতা লাভ না করার কোন কারণ নেই। বরং ঈমানের দাবীই হচ্ছে, যা হারাম তাকে হারাম জানা আর যা হালাল তাকে হালাল জানা। 'নেহী আনিল মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হলে অর্থাৎ সমাজ হতে সব ধরনের যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে তার উৎসকেই বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। ইসলামী অর্থনীতি এক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বযুগের জন্যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ হতে তাকে সমূলে উৎখাত করে।

এসব কারণে আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করেছেন। সুদ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা ও অসৎ গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে। মানুষের মধ্যকার সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন

করে। মানুষের মধ্যে ধন সঞ্চয় করে নিছক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। সমাজে ধনের অবাধ গতি ও আবর্তনে বাধা দেয়; বরং ধনের আবর্তনের গতি ঘুরিয়ে বিত্তহীনদের থেকে বিত্তবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তার কারণে সমগ্র দেশবাসীর ধন সমাজের একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ ব্যাপারটি মোটেই প্রচ্ছন্ন নেই। সুদের এ সকল প্রভাব অনস্বীকার্য। কাজেই এ সত্যটিও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যে কাঠামোর ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণ, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সুসংহত করা ও তার অর্থনৈতিক জীবন সংগঠিত করতে চায় সুদ তার প্রতিটি অংশের পূর্ণ পরিপন্থী। নগণ্যতম সুদী কারবার ও তার আপাত সর্বাধিক নিস্কলুষ অবস্থাও ইসলামের সমগ্র কাঠামো নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সুদ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ : (البقرة(٢٧٩ - ٢٧٨ :

আল্লাহকে ভয় কর আর লোকদের নিকট তোমাদের যে সুদ পাওনা বাকী রয়ে গেছে সেগুলো ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান রেখে থাক। আর যদি তোমরা এমনটি না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। -(আল বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

তৃতীয় অধ্যায়: আধুনিক ব্যাংকিং

ব্যাংকিং:

ধন-সম্পদ আমানতস্বরূপ গ্রহণকারী ঋণ ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় ব্যাংক। হোরেস হোয়াইট তার Money and Banking গ্রন্থে লিখেছেন-Bank is a manufacturer of credit and a machine for facilitating Exchange ব্যাংক হইল মূলধন সংগহকারী ও বিনিময় সুবিধার মাধ্যম।

বর্তমান সময় বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রয়োজনশীল লোকদের সুদের বিনিময়ে ঋণদানের কাজ করছে। সে ঋণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও পাওয়া যায়, আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্যও। এইরূপ ঋণদানে অভাবগ্রস্ত লোকদের আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট উপকার হচ্ছে বলে মনে হয় এবং বিরাট বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা এই ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত মূলধনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং চলছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই

আপাতঃ উপকার ও ব্যবসায়-শিল্পের এই বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজকে এক বিরাট ভাঙন ও কঠিন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যার জন্য সমাজের মূল বুনিয়াদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শোষণ-পীড়নের প্রচন্ডতায় মানব সমাজের একাংশ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে, আর অপর অংশ-যাদের সংখ্যা শতকরা দশ জনেরও কম-হয়ে যাচ্ছে, পুঁজিপতি ও কোটিপতি। মানব সমাজেকে এই মারাত্মক বিপদের গ্রাস হতে উদ্ধার করার অন্যতম প্রধান উপায় হইল বিনাসুদে ঋণদানের ব্যবস্থা। বিনাসুদে ঋণদান কার্য বায়তুলমালের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইতে পারে। আর সে জন্য ব্যাংকও স্থাপন করা যায়। বর্তমান ব্যাংক আধুনিক কালের ধন-বিনিময়ের এক উন্নততর ব্যবস্থা, সন্দেহ নেই। আর সত্য বলতে, ব্যাংকের সাহায্য ভিন্ন অর্থনৈতিক লেন-দেন ও আদান-প্রদান বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু বর্তমান সময়ে আন্তজার্তিক ধন-বিনিময় তো এটি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সম্পন্নই হতে পারে না। কাজেই ব্যাংক ব্যবস্থা চালু না রাখে উপায় নেই। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে বর্তমান নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ সুদ হল বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থার ভিত্তি, আর এই সুদ ইসলামী ব্যবস্থায় চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অতএব ইসলামী সমাজে সুদহীন ব্যাংকই প্রতুষ্ঠা করতে হবে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মতে, সুদ ছাড়া ব্যাংক আদৌ চলতে পারে না, আর ব্যংক ভিন্ন অর্থনৈতিক লেনদেন বর্তমান যেহেতু অসম্ভব, তাই ইসলামী অর্থনীতিও এ যুগে অচল। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, সুদ ভিন্ন ব্যাংক চলা এবং তা বর্তমানের ন্যায় সকল কল্যাণ লাভ করা-আর সঙ্গে সঙ্গে সুদভিত্তিক অর্থনৈতির সকল ধ্বংসকারিতা হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

ব্যাংকের লাভ ও এর হুকুম:

ফায়েদা অর্থ লাভ, বহুবচনে ফাওয়ায়েদ। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যাংকের ফায়েদা বা লাভ মানে নগদ অর্থ। বস্তুতঃ ব্যাংক ও সমিতিগুলো আমানত বা জমার অর্থ রাখার বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে বা ঋণ নিলে তার ওপর যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে, তাই ব্যাংকের দৃষ্টিতে লাভ হিসেবে তারা বর্ণনা করে থাকে। এটা মূলত রিবা বা সুদ। বরং এটিই আসল সুদ, যদিও ব্যাংক একে ইন্টারেস্ট বা লাভবলে থাকে। নিঃসন্দেহে এ ধরণের লাভ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা কর্তৃক হারাম সুদের অন্তর্ভুক্ত।

ঋণের বিনিময়ে উল্লিখিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ হারাম হওয়া সম্পর্কে, আলেমগণের ইজমা বর্ণিত আছে। তারা যেটাকে কর্জ বা ঋণ বলে থাকে, তা আসলে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ.-এর মতে ঋণ নয়। কেননা কর্জের উদ্দেশ্য হলো ইহসান, হৃদ্যতা ও সহযোগিতা করা। অথচ এ ধরণের লেনদেন প্রকৃতপক্ষে নিদিষ্ট মেয়াদে টাকার বেচাকেনা

করা ও শর্তের ভিত্তিকে নিদিষ্ট মেয়াদে লাভ করা। অতএব, বুঝা গেল ব্যাংক কর্জের বিনিময়ে বা জমাকৃত অর্থের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত লাভ দেওয়া ও নেওয়া করে, তাকে পুরোপুরি সুদই বলে। সুদ ও ব্যাংকের লাভ একটি-অপরটির নাম মাত্র।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ

ব্যাংক আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশেষ অবদান। আর সত্য কথা এই যে, ব্যাংকের বর্তমান রূপ ও সংগঠন পুজিবাদীদের শোষণ-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ার। ব্যাংকে সাধারণত দুই প্রকারের পুঁজি সংগৃহীত হয়ে থাকে।

প্রথমত, অংশীদারদের দেওয়া পুঁজি **দ্বিতীয়ত**, ধনীদের আমানতস্বরপ প্রদত্ত টাকা।

আমানতস্বরূপ রক্ষিত টাকা তিন প্রকার।

প্রথম, যাহা চাওয়া মাত্রই ফিরাইয়া পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় curremt deposit!

দ্বিতীয়, যাহা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের নিকট অর্পণ করা হয়; একে বলা হয় Fixed Deposit এবং **তৃতীয়**, Savint deposit; সপ্তাহে একবার ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ-ফিরিয়ে নেওয়া যায়। ১ ব্যাংক সংগৃহীত পুঁজির একাংশ নিজের নিকট সংরক্ষিত পুঁজি হিসাবে সব সময়ের জন্য জমা রাখিয়া দেয়। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন হতে তা পূর্ণ করা হয়। এরপর কিছু পরিমাণ পুঁজি বাজারে ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। এই পুঁজিও নগদ রিজার্ভ টাকার ন্যায় সকল সময়ই আদায়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য (liquid) হইয়া থাকে।

ব্যাংক পুঁজির একাংশ হুন্ডীর কারবারে এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করা হয়। এই পুঁজি ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে পাওয়ার যোগ্য বলতে এতে সুদের পরিমাণ খুবই সামান্য। অতঃপর ব্যাংক-পুঁজির একটি বিরাট অংশ এমন সব কাজ লগ্নি করে যাতে পুজির নিরাপত্তা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রয়োজন হলে তা বিক্রয় করে মূল পুঁজি উদ্ধার করা যেতে পারে। এইরূপ অর্থ বিনিয়োগে শতকরা ২-৪ টাকা সুদও পাওয়া যায়। সরকারী সিকিউরিটি এবং কোম্পানীর অংশ ইত্যাদি এই শ্রেণীতেই পড়ে। নগদ রিজার্ভ পুঁজির পর ব্যাংক এই সব ক্ষেত্রেও পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। কারণ ব্যাংকের আত্মরক্ষা ও স্থিতিস্থাপনের জন্য এটি অপরিহার্য। ফলে ব্যাংকের মেরুদন্ড অধিকতর দৃঢ় হয়, বিপদের সময় তা পৃষ্টপোষক হতে পারে।

ব্যাংকপুঁজির সর্বপ্রধান অংশ নিয়োগ করা হয় কারবারী ও ব্যবসায়ী লোকদিগকে এবং প্রতিপত্তিশালী বাক্তি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত ঋণ বাবদ। এই ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে সুদ লাভ হয়ে থাকে। এই জন্য প্রত্যেকটি ব্যাংকই স্বীয় পুজির সর্বপ্রধান অংশ

ব্যবসায়- সংক্রান্ত কাজ কারবারে বিনিয়োগ করতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক ব্যাংকই সাধারণত শতকার ৩০ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজি এই কাজেই বিনিয়োগ করিয়া থাকে।

মোট কথা, ব্যাংক আমানতদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং নিজেদের লগ্নিকৃাত পুঁজি যতভাবেই বিনিয়োগ ও ব্যয় করে, যা সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। বস্তুত এই সুদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় সমাজের জনগণের নিকট হতে আদায় করা হয় এবং তাদের শ্রমার্জিত অর্থ সুদ বাবদ শোষিত হয়ে (জাতীয় সম্পদ) মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির নিকট পুঞ্জীভূত হয়। আমানতকারীগণ সুদ-বাবদ যা পায় তা ঋণ-বাবদ লগ্নিকৃত অর্থের নির্দিষ্ট হারে আদায়ীকৃত সুদেরই অংশ মাত্র। ঋণ গ্রহণকারীদের নিকট হইতে ব্যাংক উচ্চহারে সুদ আদায় করে এবং আমানতকারীদিগকে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদ দেয়। এইভাবে ব্যাংকের ভাগের সুদের অবশিষ্ট অংশ হইতে ব্যাংকের যাবতীয় খরচপত্র নির্বাহ করা হয় এবং তার পরও যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তাই ব্যাংক ব্যবসায়ের মূল অংশীদারদের মধ্যে ঠিক সেই নিয়মেই বণ্টন করা হয়।

বস্তুত ব্যাংক ছোট-বড় যত কাজই করে, সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানোই হলো তার আসল ও প্রধান কাজ। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসায় করে না, ব্যবসায়ীদের জন্য সুদের বিনিময়ে পুজি যোগাড় করাই তার দায়িত্ব। এক্সচেঞ্জ ব্যাংকসমূহ সাধাণত বৈদেশিক পণ্য বা পুঁজি বিনিময়ের কাজ করে থাকে।

এ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা এই যে, ব্যাংকের এই সমস্ত কাজে সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষেরই অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কল্যাণকর-আধুনিক যুগের এই অপরিহার্য-প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত যে কারণে কলুষিত ও সমষ্টিগতভাবে মানবসমাজের জন্য মারাত্মক হয়ে দাড়িয়েছে তা হল সুদ। এই সুদ বন্ধ করে দিলেই এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও গোটা মানবতার পক্ষে প্রকৃতভাবে কল্যাণকর হতে পারে।

আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি:

প্রথমত, বর্তমান যুগে সুসভ্য মানব-সমাজের জন্য ব্যাংক যেন একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক কাজ আছে যা একমাত্র ব্যাংকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। আর ব্যাংক না হলে তা সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাংকের সাহায্যে আনেক 'এজেন্সী সার্ভিস'ও সুস্পন্ন হয়ে থাকে। সমাজের অসংখ্য লোকের হাতে কম ও বেশী পরিমাণের যে পুজি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, তা এই ব্যাংকের মারফতেই

একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হতে পারে। কিন্তু এই সব অসংখ্য কল্যাণকর কাজ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এটি মানবতার মারাত্মক ক্ষতি করছে শুধু সুদ প্রথার কারণে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকের মারফতে অসংখ্য হাতে বিক্ষিপ্ত পুঁজি এককেন্দ্রিক হয়ে তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ব্যাংক পরিচালকরা এই পুঁজি জাতীয় স্বার্থের বিপরীত কাজে-দেশবাসীর নিকট অবশিষ্ট ধন-সম্পদ নিঃশেষে লুট করার জন্য-ব্যবহার করে। সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা যে সমাজে স্থাপিত হয়, সেখানে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত না হয়ে পারে না। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুজির হাতেই কুক্ষিগত হয়। আর মুষ্টিমেয় ধনিকরাই হয় সেখানে সকল পুজির একচ্ছত্র মালিক।

এই ব্যাংকে অসংখ্য লোক টাকা জমা দেয় এ কথা ঠিক; কিন্তু জমা দেওয়া পর এই টাকার সহিত প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকে না। তাদের দেওয়া মূলধন কোন ধরনের কাজে বিনিয়োগ হচ্ছে বা হয়েছে, তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে দেশের কল্যাণ করা হচ্ছে নাকি অকল্যাণ; সে সম্পর্কে তাদের কিছুই বলার থাকে না। প্রতিশ্রুতি হারে প্রতি বৎসর সূদ আদায় করে তারা সন্তুষ্ট। কেননা তাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ হইলেও তাদের অধিক হারে সুদ লাভের সম্ভাবনা নেই। কারণ নির্দিষ্ট হারের সুদই তাহাদের চূড়ন্ত মুনাফা। পক্ষান্তরে তাদের বিরাট কোন ক্ষতি হলেও তাদের কিছুই আসে যায় না, যেহেতু তাহাদের নির্দিষ্ট সুদ সম্পর্কে পূর্বেই পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত হয়। এইরূপ মনোভাবে জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং সমাজের টাকা দ্বারাই সমাজের লোকদিগকে স্পর্ধার সহিত শোষণ করা হয়।

বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, ইহার ফলে পণ্যদ্রবের মূল্য অত্যধিক উর্ধগতি ধারণ করে। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষ অনেক অলাভজনক কাজে মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহ পায়। শৈল্পিক কারবারে উন্নতি পরিলক্ষিত হলে ব্যাংক দুই হাতে ঋণ দিতে শুরু করে, নানাবিধ শিল্পোৎপাদনের কাজে অধিক সাহায্য দান করে। ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকও সুদের হার অত্যন্ত চড়া করে দেয়। কারণ, পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সময় অধিক পরিমাণ সুদ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যবসায়িক উন্নতির আশায় শিল্পপতি ও কারখানা মালিকগণ সুদের চড়া হারেও ঋণ নিতে প্রস্তুত হয়। ব্যাংক যখন অধিক ঋণ ইস্যু করে তখন তা ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ফলে বিলিকৃত ঋণ ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং নতুন করে আর ঋণ দেওয়া হয় না। শিল্পের আর্থিক বুনিয়াদ যতই দৃঢ় হোক না কেন, সহসা ঋণ শোধ করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। তখন মূলধন স্বল্পায়তন ও হ্রাস করার একটা Depression ধারা

চলতে থাকে। ছাঁটাই ও উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস করার ফলে বেকার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিদারুন মন্দা দেখা দেয়।

বস্তুত ব্যাংকের নিকট শিল্পের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের লাভ-লোকসানের স্বার্থটাই অধিক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মূল শিল্পে ব্যাংকের কোনই অংশ নাই, ব্যাংক ঋণদাতা মাত্র। কাজেই শিল্পের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে তার কিছুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল থাকার কথা নয়। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার এই মূলীভূত দোষ বর্তমানে খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী অর্থনীতি আধুনিক ব্যাংকের মূল ভিত্তিকেই চূর্ণ করে নতুনভাবে গঠন করার নির্দেশ দেয়। ইসলামী সমাজে ব্যাংককে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির একচেটিয়া কতৃত্ব হতে মুক্ত করে সমগ্র মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত করার কথা বলে। এইজন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল বিনা সুদের ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েম করাই মানবতার শোষণ মুক্তির একমাত্র পথ।

সুদ ছাড়া কি ব্যাংক চলতে পারে? এ প্রশ্নের জওয়াবে আমাদের পাল্টা প্রশ্ন এই যে, সুদের ভিত্তিতে যখন ব্যাংক চলছে, তখন সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলতে পারবে না কেন? সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলিতে পারে ইহাই যুক্তিযুক্ত উত্তর।

ইসলামী ব্যাংকে জনগণের টাকা আমানতস্বরূপ রাখা হইবে; কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র সুদ দেওয়া বা নেওয়া হবে না। আমানতদারদের অনুমতিক্রমে তার টাকা কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলে ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ সে নিশ্চয়ই পাবে, অন্যথায় তা শুধু আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হবে। উপরন্তু প্রতিবৎসর তা হতে অনিবার্যরূপে যাকাত আদায় করা হবে। ব্যাংকের খরচ বাবদ কিছু কমিশনও উক্ত টাকা হতে কেটে নেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া ইসলামী সমাজে ব্যাংককে মূল শিল্প-ব্যবসায়ের পুজি বিনিয়োগকারী অংশীদারও করা যেতে পারে। অর্থাৎ ব্যাংক মূলধনের সুদ পাবে না, পাবে মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ। অতএব, তাকে লোকসানেরও ভাগীদার হতে হবে। বস্তুত বর্তমান যুগে মূলধন ও মূল শিল্পের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দূর করে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধনের এটিই একমাত্র উপায়। এর ফলে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন মূলধনের অভাব হবে না, অনুরূপভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার

দরুন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত শিল্প ও মূলধনের এরূপ সমন্বয় সাধন এক মাত্র ইসলামী সমাজ ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্ভব না।

এখানে আর একটি কথাও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে usury ও interest এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যদিও কেউ কেউ মনে করে যে, কুরআন হাদীসে যে 'রিবা' হারাম করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া, ঋণের বিনিময়ে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থই বুঝায়। কিন্তু ব্যবসায়ী কাজে লগ্নিকৃত টাকার নির্দিষ্ট হারের মুনাফা interest গ্রহণ নিষিদ্ধ না। কিন্তু এইরূপ ধারণা কুরআন হাদীসের সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কুরআন মজীদে যে সুদ হারাম করা হয়েছে তা যত রকমেরই হোক না কেন এবং তা লাভ করার জন্য যে পন্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন, সবই সম্পূর্ণরূপে হারাম।

ইসলামি ব্যাংক-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। সুদমুক্ত এই ব্যাংক ব্যবস্থা 'মুজারিবাত' নীতিতে এই ধরনের আরো বহু প্রতিষ্ঠান কায়েম করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্যকারী হবে। এতে শ্রম ও মূলধন পরস্পরের সাথে মুনাফার অংশীদার হিসাবে মিলিত হবে। বস্তুত শ্রম ও মূলধনে স্থায়ী সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপারটিকে নৈতিক আদর্শ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে স্থাপিত ও পরিচালিত করা সম্ভব হবে। উভয় পক্ষের নৈতিক দায়িত্বকে উভয়ের ঈমানের অংশরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে মুজারিবাতের নীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন ইউনিটের শরীকদারীতে সকল প্রকার কৃষি ব্যবসায় ও শিল্পসংক্রান্ত কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়েজন পূরণের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দানের ব্যবস্থা হওয়া একান্তই জরুরী, ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধরনের ঋণ সরকারী ক্রেডিট এজেন্সী কিংবা নাগরিকদের দ্বারা গঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন কোন সম্পত্তির উপর দলীল করে অতি সহজেই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্যাংক ও ব্যাবসায়ীদের একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। মিসরে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবসায় বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব হতে বিশেষ সাফল্য সহকারে চলে আসছে এবং তা ক্রমশঃ বিকাশ ও অগ্রগতি লাভ করছে। যা এই পর্যায়ে উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ। করাচীতেও এই ধরনের একটি সুদবিহীন তথা মুনাফা ভিত্তিক ব্যাংক কায়েম করা হয়েছিল; কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী অসহযোগিতার দরুনই শেষ পর্যন্ত তা অচল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বর্তমান বাংলাদেশেও এর সূচনা হয়েছে বটে, তবে তা সম্পূর্ণ জায়েয ও সুদমুক্তভাবে চলতে পারছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার।

বস্তুত ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম। কারণ, ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে বলেই তা হবে সুদবিহীন ব্যাংক। সুদব্যবস্থা না থাকলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না, এমন কথা বলারও কোন যুক্তি নেই। সুদ ব্যবস্থার দরুনই বরং মূলধন সংগ্রহের কাজ মন্থর গতিতে চলে ও মারাত্মক ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়। সমাজে ও দেশে ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দেয়, এবং অর্থ-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম ও মারাত্মক ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়, না ইনসাফী ও আকাশছোয়া বৈষম্য দেখা দেয়, এবং অর্থ-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম না-ইনসাফী ও আকাশছোয়া বৈষম্য দেখা দেয়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান কার্যক্রম:

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো কখনো এ যুক্তি পেশ করা হয় যে, বিগত তিন দশক যাবত যেসব ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসছে, সেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সেটআপে এমনকি শুধু অর্থায়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ছত্রছায়ায় "সম্পদ বণ্টনে ইনসাফ" এর জোর দাবী করা অতিরঞ্জিত বৈ কিছুই নয়।কিন্তু এ আপত্তিকর সমালোচনা বাস্তব সম্মত নয়। কেননা

প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে প্রচলিত ব্যাংকেসমূহের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থান সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে এক ফোঁটা পানির সমতুল্য। সুতরাং এ স্বল্প সময়ে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের মহাবিপ্লব ঘটানোর ধারণা করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনো তাদের শৈশবকাল অতিক্রম করছে। তাদেরকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সকল চুক্তিতে শরীয়তের সকল শর্ত পালনে সক্ষম হয় না। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত সকল চুক্তি ও লেনদেনকে শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, কর ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এমন কিছু বিশেষ সুযোগ (রুখসাত ও রেয়ায়াত) প্রদান করা হয়, যা শরীয়তের মৌলিক ও আদর্শিক নিয়ম-নীতি ভিত্তিক নয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তার বিধি-বিধানের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি হল- শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ ভিত্তিক। যেগুলোর উপর সাধারণ অবস্থায় আমল করা হয়। দ্বিতীয়টি হল- সুযোগ-অবকাশ তথা রুখসাত ভিত্তিক। যেগুলোর উপর জরুরী ও অস্বাভাবিক অবস্থায় আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি প্রথমটি তথা আদর্শিক মূলনীতির উপর। আর দ্বিতীয়টি হল রুখসাত যা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটিত হয় না।

অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকসমূহ দ্বিতীয় প্রকারের বিধানাবলী তথা রুখসাতের উপরই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও সুস্পষ্ট কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। তবে যদি পুরো অর্থায়ন পদ্ধতি ইসলামের আদর্শ ও মৌলিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই অর্থব্যবস্থার উপর এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: বিকল্প সমাধান

সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা:

উপরের আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ। তাই সুদী ব্যাংকিং বন্ধ ও তার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করার আগে কিছু মৌলিক বিষয় জেনে নেয়া জরুরি।

১. সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিৎ নয় যে, প্রচলিত ব্যাংক যত কাজ যে প্রক্রিয়ায় করে চলেছে তার সব কাজ কমবেশি সে প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে হবে এবং তার উদ্দেশে কোনো পার্থক্য হতে পারবে না। কেননা, এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়ে আসছে যদি তাই করতে হয়, তাহলে 'বিকল্প ব্যবস্থার' কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

বরং 'বিকল্প'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান বাণিজ্যিক পরিবেশে ব্যাংকের জন্য যে কাজ জরুরি বা উপকারী, তা সম্পাদন করার জন্য এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা যা শরীয়তের মূলনীতির গণ্ডির মধ্যে থাকে, যা দ্বারা শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। আর যে কাজ শরয়ী মূলনীতির আলোকে জরুরি বা উপকারী নয় এবং যাকে শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী সাজানো যায় না, তা থেকে দূরে থাকা।

২. যেহেতু সম্পদ বণ্টনের পুরো ব্যবস্থার উপর সুদ নিষিদ্ধের প্রভাব পড়ে, তাই এ আশা করাও ভুল যে, সুদের শরয়ী বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর করলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লাভের হার তাই থাকবে যা এখন সুদী ব্যবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে; বরং বাস্তব হল, যদি ইসলামী বিধান সঠিকভাবে কার্যকর করা হয় তাহলে এ অনুপাতের মধ্যে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে; বরং এ পরিবর্তন একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন।

৩. বর্তমানে ব্যাংক যে সেবা প্রদান করে তন্মধ্যে এ বিষয়টা উপকারী; বরং বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে জরুরি, সে মানুষের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র করে তা শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার মাধ্যম হয়। এ সঞ্চয় যদি মানুষের পকেটে পড়ে থাকত তাহলে তা দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে কোনো ফায়দা পাওয়া যেত না। বলাবাহুল্য, সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ অলস পড়ে থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতেও কাম্য নয় এবং অর্থনৈতিকভাবেও তাকে কল্যাণকর বলা যায় না।

কিন্তু এ সঞ্চয়কে শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার জন্য যে পন্থা প্রচলিত ব্যাংক অবলম্বন করেছে, তা ঋণের পন্থা। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠান পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করে, সে অন্যের আর্থিক উপকরণগুলো নিজের লাভের জন্য এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে ঐ উপকরণ থেকে উৎপাদিত সম্পদের বেশিরভাগ অংশ তার নিজের কাছেই জমা থাকে এবং পুঁজির আসল মালিকরা উপরে উঠার যথাযথ সুযোগ না পায়।

সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক হল শুধু এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা টাকার লেনদেন করে। এ টাকা দ্বারা যে কারবার হচ্ছে তার লাভ কত আর এর দ্বারা কার উপকার হচ্ছে আর কার ক্ষতি হচ্ছে- এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলামী বিধানের আলোকে ব্যাংক এমন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবশিষ্ট থাকতে পারে না যার কাজ শুধু অর্থের লেনদেন করা। তার পরিবর্তে তাকে এমন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানাতে হবে, যে বিভিন্ন মানুষের সঞ্চয় একত্র করে তা সরাসরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। আর যেসব লোকের সঞ্চয় সে জমা করবে তারা সবাই সরাসরি সে ব্যবসার অংশীদার হবে। তাদের লাভ ক্ষতি সে ব্যবসার লাভ ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যা তাদের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হবে তার উপর এ আপত্তি করা উচিৎ নয় যে, ব্যাংক তার পূর্বের অবস্থান শেষ করে দিয়ে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেননা, যার কারণে বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা হচ্ছে সে প্রয়োজন এ ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না।

৪. চতুর্থ কথা হল, শত শত বছর ধরে জেঁকে বসা কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সর্বদা সমস্যা একটু হবেই, কিন্তু ব্যবস্থার পরিবর্তন যদি জরুরি হয় তাহলে শুধু এ সমস্যার উপর ভিত্তি করে নতুন ব্যবস্থা অগ্রহণযোগ্য বলে স্থির করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। এ অবস্থায় সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। সমস্যার ভয়ে পিছপা হওয়া যায় না।

ব্যাংকিংয়ের শরীয়তসম্মত পন্থা

ব্যাংকের সম্পর্ক হয় দুতরফা। একদিকে তার সম্পর্ক সেসব লোকের সাথে যারা তাদের টাকা ব্যাংকে আমানত রাখে। অন্যদিকে সেসব লোকের সাথে সম্পর্ক হয় যাদের কাছে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে, অর্থাৎ মূলধন সরবরাহ করে। উভয় ধরনের সম্পর্কের উপর ভিন্নভাবে আলোকপাত করা হল।

ব্যাংক ও ডিপোজিটরের সম্পর্ক

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয় তাকে আজকাল ব্যাংকিংয়ের পরিভাষায় 'আমানত' বলে, কিন্তু ফিকাহের দৃষ্টিতে তা প্রকৃতপক্ষে ঋণ। যদি ব্যাংককে ইসলামী পদ্ধতিতে চালানো হয় তাহলে আমানতকারীদের সাথে ব্যাংক শিরকাত বা মুদারাবা পদ্ধতিতে লেনদেন করবে। এ পদ্ধতিতে এ টাকা ঋণ হবে না; বরং তখন অবস্থাটা হবে এমন, টাকা আমানতকারী হবে 'রাব্বুল মাল' (পুঁজির মালিক), ব্যাংক হবে 'মুদারিব' (ব্যবসায়ী), আর আমানতকৃত অর্থ হবে 'রাসুল মাল'
(বিনিয়োগকৃত মূলধন), যার উপর ব্যাংক নির্দিষ্ট কোনো হারে লাভ দিতে বাধ্য থাকবে না; বরং যা লাভ হবে তা একটি ধার্যকৃত অনুপাতে বণ্টিত হবে।

তারপর ব্যাংক কারেন্ট একাউন্টে আজও ডিপোজিটরদের কোনো সুদ প্রদান করে না। ইসলামী পদ্ধতিতেও এ হিসাবের উপর কোনো মুনাফা দেয়া হবে না। কারেন্ট একাউন্টে জমাকৃত টাকা ডিপোজিটরদের পক্ষ থেকে ব্যাংককে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ মনে করা হবে। তবে অন্যান্য লাভজনক হিসাব মুদারাবা বা শিরকাতের হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ হিসাবগুলোকে মুদারাবা বা শিরকাতে পরিবর্তন করতে একটা প্রায়োগিক সমস্যা মনে হয় যে, শিরকাতের সাধারণ নিয়ম হল সব হিসাবধারীর টাকা একসাথে সম্মিলিত হিসাবে

অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। একই সময়ে লাভ লোকসান হিসাব করে সব অংশীদারদের মধ্যে লাভ লোকসান বণ্টন করা হয়, কিন্তু ব্যাংকের বেলায় তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা, এখানে মানুষের অর্থ জমা করা এবং উত্তোলন করার ধারাবাহিকতা লাগাতার জারি থাকে। ফিক্সড ডিপোজিটের বেলায় যদিও উঠানোর মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু জমা রাখার সময় নির্দিষ্ট থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন ফিক্সড ডিপোজিটের হিসাব চালু করতে পারে। আর সেভিং একাউন্টে টাকা উঠানোর এবং জমা রাখার কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই।

এর একটা সমাধান এমন, এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং মানুষকে বাধ্য করা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা করবে এবং নির্দিষ্ট তারিখেই তা উত্তোলন করবে। আর শিরকাতের মেয়াদ ত্রৈমাসিক বা মাসিক নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক মেয়াদান্তে লাভলোকসান হিসাব করে তা বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় প্রথমত মানুষের জন্য ব্যাংকে অর্থ রাখার ব্যাপারে ঝামেলা হবে। একই তারিখে জমা রাখা এবং একই তারিখে উঠানোর বেলায় ব্যাংকের উপর চাপও বৃদ্ধি পাবে। ফলে অনেক সঞ্চয় কাজে লাগা থেকে বাদ পড়বে।

সুতরাং ব্যাংকের শিরকাত ও মুদারাবার লভ্যাংশ বণ্টনের আরো একটা পদ্ধতি কোনো কোনো মহলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। একে একাউন্টিং-এর পরিভাষায় Daily Product Basis দৈনন্দিন হিসাব বলে। এ প্রস্তাবের সারকথা হল, অংশীদারদের এ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে, তারা যখন ইচ্ছা বিশেষ বিধান মোতাবেক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে বা জমা করতে থাকবে, কিন্তু যখন এক শিরকাতের মেয়াদ শেষ হবে তখন দেখা হবে, এ মেয়াদে কত টাকা কত দিন ব্যাংকে থাকল। আর প্রতি টাকায় প্রতিদিনে লভ্যাংশের গড় কত।

শিরকাত ও মুদারাবা:

সুদের বিপরীতে সঠিক ইসলামী বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাত ও মুদারাবা। যা সুদের চেয়ে কয়েকগুণ ভাল ফলাফল বহনকারী। এটা পুঁজি বিনিয়োগের অত্যন্ত সুষম ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। সম্পদ বণ্টনের উপর যার খুবই ভাল প্রভাব পড়ে। শিরকাত ও মুদারাবা ব্যবস্থা চালু হলে ব্যাংকের নাম ব্যাংকই থাকুক আর যাই থাকুক, কিন্তু ব্যাংকের এ অবস্থান শেষ হয়ে যাবে। তখন ব্যাংক যথারীতি কারবার পরিচালনা করবে।

শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, শিরকাতের মধ্যে অংশীদারগণ মূলধনের মধ্যেও শরিক হয় এবং কাজের মধ্যেও শরিক হতে পারে। কেউ কার্যত কারবারে হস্তক্ষেপ

না করলে সে ভিন্ন কথা। আর মুদারাবার মধ্যে মূলধন থাকে পুঁজি সরবরাহকারীর আর কাজ করে কারবারী। পুঁজি সরবরাহকারী কারবারে অংশগ্রহণ করে না।

মুদারাবা ও মুশারাকা:

"মুদারাবা" (Mudarabah) অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে অংশীদারিত্বে এক-শরীক অপরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহ করে। পুঁজি বিনিযোগ করে প্রথম পক্ষ, তাকে বলা হয় "রাব্বুলমাল" বা "পুঁজি বিনিযোগকারী"। অপরদিকে ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management) এবং কাজের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর, যাকে বলা হয়, "মুদারিব" বা "কারবারি"।

মুদারাবা ব্যবস্থা: মুদারাবা এমন একটি অংশীদারী কারবার যেখানে এক পক্ষ পূর্ণ মূলধন সরাবরাহ করে আর অন্য পক্ষ শ্রম, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। মূলধনের মালিককে 'সাহেবে মাল' এবং মূলধন ব্যবহারকারীকে 'মুদারিব বলে'। উভয়েই এক বা একাধিক হতে পারে।

মুদারাবা দুই প্রকার হতে পারে। যেমন:
১। মুদারাবা মুতলাক
২। মুদারাবা মুক্কাইয়াদা

মুদারাবা মুতলাক ও মুক্কাইয়াদা-এর পরিচিতি:

মুদারাবা মুতলাক: যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, সময়সীমা, শ্রেণি, অংশীদারগণের সংখ্যা, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না, তাকে 'মুদারাবা মুতলাক' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে যে কোনো স্থানে, যে কোনো পণ্যের স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

মুদারাবা মুক্কাইয়াদ: যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, ব্যবসার ধরন, সময়সীমা, অংশীদারগণের সংখ্যা, মালামাল ক্রয়ের বিবরণ, কোথায় বিক্রয় করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো নিদিষ্ট করে দেয়া হয়, তাকে 'মুদারাবা মুক্কাইয়াদা' বলে। এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সাহেবে মালের নির্দেশ মোতাবেক উদ্যোক্তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে তা অবৈধ হবে।

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাকে আর্থিক পুঁজি দিয়ে থাকে। ব্যবসার লাভ ব্যাংক এবং উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়। পরে তা উভয়ে ভাগ করে নেয়। ব্যবসায় যদি প্রকৃত লোকসান হয়, তবে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংককেই সমস্ত লোকসান বহন করতে হয়। এটিই ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ।

মুদারাবা ব্যবসা: রাব্বুলমাল মুদারিকে বিশেষ ধরনের ব্যবসা করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুদারিবকে শুধুমাত্র রাব্বলমালের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবসায় অর্থ বিনিযোগ করতে হবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুক্কাইয়াদা' বলা হয়। পক্ষান্তরে রাবুবলমাল যদি মুদারিবকে যে কোনো ধরনের ব্যবসা করার স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুত্বলাকা' বলা হয়।

মুশারাকা: একজন রাব্বুলমাল একই চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবার চুক্তি করতে পারে। অর্থাৎ, রাব্বুলমাল তার পুঁজি 'ক' এবং 'খ' উভয়কে (যৌথভাবে) প্রদান করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই রাব্বলমালের জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে, মুদারিবের অংশ তাদের উভযের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে উভয় মুদারিব পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসার কাজ পরিচালনা করবে।

মুদারিব একজন হোক কিংবা একাধিক হোক, তারা ব্যবসায় ঐ সকল কাজ করতে পারবে, যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোনো অসাধারণ কাজ করতে চায়, যা ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুলমালের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতে পারবে না।

মুনাফা বন্টন: মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম জরুরি শর্ত হল, কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষ প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে, সে অনুযায়ী রাব্বুলমাল এবং মুদারিব উভয়ে লভ্যাংশের পাওনাদার হবে। শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের নিদিষ্ট কোনো অনুপাত বর্ণনা করেনি, বরং তা নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তারা লভ্যাংশে সমহারেও অংশীদার হতে পারে কিংবা রাবলমাল এবং মুদারিবের জন্য পৃথক পৃথক অনুপাতও নিদিষ্ট করতে পারে। তবে, তারা কোনো পক্ষের জন্য নিদিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য করতে পারবে না। এমনিভাবে কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথেও নিদিষ্ট করতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ: মূলধন যদি এক লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ হাজার টাকা মুদারিব পাবে। এবং এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, (যেমন) মূলধনের ২০% রাবুবলমালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করতে পারবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বলমাল পাবে, কিংবা ৬০% মুদারিব এবং ৪০% রাব্বলমাল পাবে।

বিভিন্ন অবস্থায় মুনাফার বিভিন্ন অনুপাত ধার্য করাও জায়েয আছে।
যেমন: রাব্বলমাল মুদারিবকে একথা বলতে পারে যে, তুমি যদি গমের ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৫০% পাবে, আর যদি আটার ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৩৩% পাবে। এমনিভাবে রাব্বলমাল একথাও বলতে পারে যে, তুমি যদি নিজ শহরে ব্যবসা কর, তাহলে ৩০% পাবে, আর যদি ভিন্ন শহরে ব্যবসা কর, তাহলে মুনাফায় তোমার অংশ ৫০% হবে। মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবি করতে পারবে না।

ফিকহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মুদারিব পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসা পরিচালনার কারণে কোনো রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবি করতে পারবে না। তবে ইমাম আহমাদ রহ. মুদারিবকে মুদারাবা একাউন্ট থেকে শুধুমাত্র দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু হানাফী ফিকহবিদদের নিকট মুদারিব মুদারাবা একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ ঐ সময় গ্রহণ করতে পারবে, যখন সে মুদারাবা ব্যবসার জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে। তখন সে তার থাকা খাওয়া ইত্যাদির খরচ গ্রহণ করতে পারবে। নিজ শহরে থাকাকালীন সময়ে দৈনিক কোনো খরচের পাওনাদার হবে না।

যদি মুদারাবার কোনো ব্যবসায় লোকসান হয় এবং কোনো ব্যবসায় লাভ হয়, তাহলে প্রথমে লাভ দ্বারা লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্ষতিপূরণের পর যা থাকবে, তা উভয়ের মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।

মুদারাবা সমাপ্ত করা: মুদারাবা চুক্তি উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারে। সমাপ্তির সময় মুদারাবার সমুদয় সম্পদ যদি তরল আকৃতির হয় এবং মূলধনের বিনিময়ে কিছু মুনাফাও অর্জিত হয়, তাহলে তা উভয়ের মাঝে মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু মুদারাবার সম্পদ যদি তরল আকৃতির না হয়, তাহলে মুদারিবকে মুদারাবার সম্পদ বিক্রয় করে তারল্যে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।

মুসলিম ফিবিদদের এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, মুদারাবাকে এমন কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে নির্ধারণ করা যাবে কিনা যে, মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মুদারাবা চুক্তি নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী মুদারাবাকে সুনিদিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে। যেমন: এক বছর, ছয় মাস ইত্যাদি। যার পরে মুদারাবা বিনা নোটিশে সমাপ্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালেকী এবং শাফেয়ী ফিহবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মুদারাবাকে নিদিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

তবে ফিকহবিদদের এ মতবিরাধ মুদারাবার মেয়াদের সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু উভয়ের পক্ষ থেকে মুদারাবার এমন কোনো সবনিম্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যার পূর্বে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করা যাবে না? ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলিতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি মূলনীতি যা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে না; বরং উভয়পক্ষের যে কেউ যখন ইচ্ছা করবে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করতে পারবে।

উভয়পক্ষের মুদারাবা সমাপ্তি করার এই অসীম স্বাধীনতা বর্তমান যুগে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা দেখানোর জন্য বেশ কিছু সময়, দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্তসম্পন্ন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ কারণে রাব্বলমাল যদি ব্যবসার একেবারেই শুরুর-লগ্নে মুদারাবা সমাপ্ত করে দেয়, তাহলে তা এই প্রকল্পের জন্য বিরাট জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে মুদারিবের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হবে, কেননা সে সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও কোনো কিছু অর্জন করতে পারেনি। এজন্য মুদারাবা চুক্তির প্রারম্ভেই যদি উভয়পক্ষ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোনো পক্ষ একটি সুনিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ কোনো সমস্যা ব্যতীত মুদারাবাকে সমাপ্ত করবে না, তাহলে এ শর্তটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়তের কোনো মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না।

মুশারাকা ও মুদারাবার সমন্বয়: সাধারণ অবস্থায় এটাই মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করে না, সে শুধু ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার, সমুদয় পুঁজি রাব্বলমাল বিনিয়োগ করে। কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মুদারিবও তার কিছু পুঁজি মুদারাবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়, এ ক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা চুক্তিদ্বয় একত্রিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ- 'A', 'B' কে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লাখ টাকা প্রদান করল। অতঃপর 'B. 'A এর সম্পতিতে নিজের পক্ষ থেকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা মুদারাবায় সংযুক্ত করল। এ জাতীয় অংশীদারিত্বের সাথে মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত মু'আমালা করা হবে। এখানে মুদারিব নিজের জন্য অংশীদার হিসেবে মুনাফার বিশেষ একটি অংশ ধার্য করতে পারবে। এর

সাথে সাথে সে মুদারিব হিসেবে মুদারাবার ব্যবস্থাপনা এবং পরিশ্রমের কারণে মুনাফার আরেকটি অংশ ধার্য করতে পারবে। উল্লেখিত উদাহরণে মুনাফা এ ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে, কিন্তু (এই দুই-তৃতীয়াংশ বণ্টনে) উভয়পক্ষ অন্য কোনো আনুপাতিক হারের উপরও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এতটুকু শর্ত যে, নিষ্ক্রিয় অংশীদার স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে, 'A' নিজের জন্য সমুদয় মুনাফার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ধার্য করতে পারবে না। কেননা, তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি সমুদয় পুঁজির দুই-তৃতীয়াংশের অধিক নয়।

শিরকাত ও মুদারাবার সমস্যা: শিরকাত ও মুদারাবা চালু করতে সাধারণত দুধরনের সমস্যার কথা বলা হয়:

১.আজকাল বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর মান অনেক নিচে নেমে গেছে। কাউকে শিরকাতের ভিত্তিতে মূলধন সরবরাহ করলে সে কখনো প্রকৃত লাভের কথা বলে না; বরং লাভের স্থলে লোকসান দেখায়। এ কারণে শিরকাত ও মুদারাবার ভিত্তিতে কাজ করা কঠিন। এর উত্তর, বাস্তবিকই সমাজে অবিশ্বস্ততার অবস্থা দুঃখজনক, কিন্তু অবিশ্বস্ততার কারণে কখনো কোনো কাজ বন্ধ হয় না। বিভিন্ন পন্থায় অবিশ্বস্ততার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন অডিট ব্যবস্থা, একাউন্টস ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ইত্যাদি। মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যেও এ ধরনের কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। সে সাথে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একবার অবিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে, তাকে সব ব্যাংকে ব্লাক লিস্টভুক্ত করা যেতে পারে। যার অর্থ, এরূপ ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো ব্যাংক থেকে মূলধন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এছাড়া অন্য আরো আইনী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এক ব্যাংক একা যদি এ কাজ করে তাহলে তার জন্য সত্যিই কষ্টকর, কিন্তু যদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজ করা হয় এবং সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা এ নিয়ম অনুযায়ী চলে, তাহলে মিথ্যাচারের পথ বন্ধ করার রাস্তা বের হতে পারে।

২.দ্বিতীয় সমস্যা হয় ইনকাম ট্যাক্স ব্যবস্থার কারণে। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ দুধরনের খাতা বানায়। ইনকাম ট্যাক্সের জন্য আলাদা খাতা থাকে, আর প্রকৃত খাতা থাকে অন্য আরেকটা। এ অবস্থায় মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে মূলধন গ্রহণকারী যদি প্রকৃত লাভ দেখায় তাহলে ইনকাম ট্যাক্সওয়ালা আটকাবে। আর যদি সে ব্যাংককে প্রকৃত লাভ না দেখায় তাহলে প্রকৃত লাভের বণ্টন হয় না। এর উত্তর হচ্ছে, সরকারীভাবে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হলে দেখা যায়, মুশারাকা ও মুদারাবাকে সফল করার জন্য ট্যাক্স ব্যবস্থার সংশোধনও জরুরি। ট্যাক্সকে আমদানির সাথে সম্পৃক্ত না করে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ট্যাক্সের এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যাতে মিথ্যাচারের এ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাছাড়া অর্থ বিনিয়োগের অনেক খাত এমন আছে যেখানে শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে অনেক দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হবে না। যেমন রপ্তানি সংক্রান্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে রপ্তানিকৃত মালামালের ব্যয় এবং সম্ভাব্য ধারণাকৃত মূল্য জানা থাকে। সুতরাং এর মধ্যে শিরকাত বা মুদারাবায় ধোঁকা প্রতারণার সম্ভাবনা অনেক কম।

তেমনিভাবে ব্যাংক ব্যবসায়ীর পুরো কারবারের মধ্যে শরিক হওয়া জরুরি নয়। সে কারবারের কোনো নির্দিষ্ট অংশেও শরিক হতে পারে, যাতে লাভ নির্ধারণ বেশি কঠিন হবে না। এছাড়া ব্যাংকের জন্য যেহেতু ব্যবসায়ীর সাথে স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক শরিক থাকা জরুরি নয়; বরং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের দালান, মেশিনারি ইত্যাদি পূর্ব থেকেই বিনিয়োগ করেছে। আর ট্যাক্স যেহেতু উপার্জিত লাভের উপর আরোপ হয়, এ কারণে ট্যাক্স সমস্যারও সমাধান বেরিয়ে আসবে।

বাইয়ে সালাম:

বাইয়ে সালাম মানে ক্রেতা মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করবে, আর পণ্য পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করবে। যেমন: ক্রেতা ১ হাজার টাকা নগদ দেবে। ৪ বা ৫ মাস পর বিক্রেতা ক্রেতাকে ৩ বা ৪ মণ ধান দেবে। এ ধরনের বেচা-কেনাকে বাইয়ে সালাম বলে।

বাইয়ে সালাম বা বাইয়ে সলফ:
আরবি শব্দ সালাম অর্থ হস্তান্তর করা। যেহেতু এ ধরনের বেচাকেনায় টাকা অগ্রিম হস্তান্তর করা হয় আর পণ্য পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করা হয়, তাই এই বেচা-কেনাকে বাইয়ে সালাম বলে। এর আরেকটি নাম হলো বাইয়ে সলফ।

বাইয়ে সালামের প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও বিশুদ্ধ হাদিস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে খেজুর ও ফসলে বাইয়ে সালামের ব্যাপক প্রচলন ছিল।
মদিনার স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীরা অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে, কম দামে পণ্য খরিদ করত। আর বিক্রেতারাও চাষাবাদ খরচ বহন করার জন্য অগ্রিম মূল্য নিতে তথা বাইয়ে সালাম করতে আগ্রহী ছিল।

ইসলামি শরীয়তে, বেচাকেনাতে সামান্য ধরনের অস্পষ্টতার কারণেও যেখানে বেচাকেনাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে বাইয়ে সালামকে পণ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শুধু গুণাগুণ জানা থাকার শর্তে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে এর বৈধতার প্রমাণ রয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, "হে মুমিনরা! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখ।" [সুরা বাকারা]

হাদিসে এরশাদ হয়েছে, ইবন আব্বাস রা. বলেন, "আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, বাইয়ে সালাম সম্পর্কে কুরআনে এক নাতিদীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি উপরিউক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. যখন মদিনায় পদার্পণ করেন, তখন মাদিনাবাসী এক, দুই ও তিন বছর মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ফল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তা দেখে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য করে।" [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা রা. বলেছেন, আমরা নবী সা. এর যুগে, আবু বকর রা. এর যুগে ও ওমর রা. এর যুগে বাইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) করতাম। ইজমার আলোকেও বাইয়ে সালাম প্রমাণিত। কারণ আগের ও পরের প্রায় ফকিহই এই ব্যাপারে একমত যে, বাইয়ে সালাম হালাল।

আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেন, "এতে একদিকে বিক্রেতা অগ্রিম মূল্য দ্বারা নিজের পরিবার ও উৎপাদনের ব্যয়ভার বহনে সমর্থ হয়, অন্যদিকে ক্রেতা ও সুবাদে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং এ উপকারী ব্যবসা অবশ্যই হালাল বিবেচিত হবে।" হাদিস ও ফিকহের সব নির্ভরযোগ্য কিতাবে বাইয়ে সালামের বৈধতার বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইয়ে সালাম একটি লেনদেন প্রক্রিয়া হলেও, সাধারণ বেচাকেনার মতো লেনদেন নয়। কারণ তাতে পণ্য পরবর্তী সময়ে পরিশোধ করার কারণে পণ্যের কোয়ালিটি ও গুণাগুণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে, যা সাধারণ বেচাকেনাতে নেই। তাই বাইয়ে সালাম এমন পণ্যসামগ্রীতে বৈধ যেগুলোর পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণ করা সম্ভব।

বাইয়ের সালামের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

১. পণ্য ও মূল্য সুনিদিষ্ট করা। অর্থাৎ ধান বেচাকেনার ক্ষেত্রে ধানের প্রকার, গুণগত মান এবং পরিমাণ সুনির্ধারিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী মূল্যও চূড়ান্ত হওয়া।

২. পূর্ণ মূল্য চুক্তির সময়ই হস্তগত করা এবং পণ্য প্রদানের তারিখ ও স্থান নির্ধারিত করে নেওয়া।

৩. কোনো নিদিষ্ট ক্ষেতের ধান দেওয়ার শর্তে না করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নিদিষ্ট ক্ষেতের ধান বা নিদিষ্ট বাগানের ফল দেওয়ার শর্ত করলে, বাইয়ে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। বরং বিষয়টিকে আম বা সাধারণ রাখতে হবে, যাতে যেকোনো ক্ষেতের ধান যেকোন বাগানের ফল দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ থাকে।

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাইয়ে সালামে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার কারণে সাধারণ মার্কেট মূল্যের চেয়ে খুব বেশি তারতম্য হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে তা গুবনে ফাহেশ (চরম লোকসান) হয়ে যাবে, যা নিষিদ্ধ।

ইজারা

এটাও পুঁজি বিনিয়োগের একটি শরয়ী পন্থা, যাকে Leasing বলে। শুধু ইজারা শব্দ দেখে কোনো লেনদেনকে শরীয়তসম্মত বলে স্থির করা উচিৎ নয়। কারণ, বর্তমানে সাধারণত ইজারায় যে লেনদেন হয় তার মধ্যে ইজারার প্রকৃত অবস্থা বিদ্যমান নেই। ইজারার প্রকৃত অবস্থা হল, ইজারাদাতা (Lessor) যে মেশিনারি ইত্যাদি ভাড়ায় দিচ্ছে সে তার মালিক ও দায়বহনকারী হবে, কিন্তু বিনিয়োগ ইজারায় বর্তমানে কার্যত এরূপ হয় না। ইজারাদাতা (Lessor) মেশিনারির কোনো প্রকার দায় গ্রহণ করে না। যদি যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তা ইজারা গ্রহণকারীর (Lessee) ক্ষতি বলে মনে করা হয়। এমনকি কোনো দুর্ঘটনায় যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গেলে তখনও ইজারা গ্রহীতা তার ভাড়া প্রদান করতে থাকে। যন্ত্রপাতির সাথে ইজারাদাতার সম্পর্ক শুধু এতটুকু থাকে, ভাড়া পরিশোধ না করলে সে যন্ত্রপাতি বিক্রি করে নিজের ঋণ উসুল করে নেবে। সুতরাং বর্তমানে সাধারণত প্রকৃত ইজারা হয় না। আসল উদ্দেশ্য তো শুধু সুদের উপর ঋণ প্রদান করা, কিন্তু ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য ইজারার নাম ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লেনদেন শরয়ীভাবে জায়েয নেই। তবে হাঁ, যদি প্রকৃতপক্ষে

ইজারাদাতা যন্ত্রপাতির মালিক হয় এবং সে এর দায় স্বীকার করে নিয়ে ইজারাচুক্তি করে, তাহলে তার অবকাশ আছে। আর ভাড়া নির্ধারিত করার সময় এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, যন্ত্রপাতির মূল্য কিছু লাভসহ উসুল হলে তার মধ্যেও শরয়ী কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু চুক্তির মধ্যে এ শর্ত আরোপ করা যাবে না যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা গ্রহীতার মালিকানায় চলে যাবে। কারণ, এর মধ্যে চুক্তির ভিতর আরেক চুক্তি-এর অবস্থা তৈরি হয়। তবে পূর্ব শর্তারোপ ছাড়া মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার কাছে মালিকানা স্থানান্ত রের অবকাশ আছে।

মুরাবাহা:

মুরাবাহার সংজ্ঞা: মুরাবাহা শব্দটি 'রিবহ' শব্দ থেকে উদগত। এর অর্থ- অতিরিক্ত, বাড়তি, লাভ ইত্যাদি ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় মুরাবাহা বলা হয় "ক্রয় মূল্যের ওপর লাভ নিয়ে অপর কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা"। পবিত্র কুরআনে মুনাফা নিয়ে লাভ করা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাইয়ে মুরাবাহা লাভজনক ব্যবসার একটি পদ্ধতি।

মুরাবাহা ইসলামী শরিয়াহ্ সম্মত এমন এক প্রকারের বিক্রয় পদ্ধতি, যেখানে বিক্রেতা স্পষ্টভাবে পণ্যের ক্রয়মূল্য, পণ্যের বিক্রয়মূল্য এবং উক্ত বিক্রয় থেকে তার লব্ধ লাভের পরিমাণ ক্রেতাকে বিক্রয়ের সময় জানিয়ে দেয়। এজন্য এটি ইসলামী অর্থনীতির বাইউল আমানাহ্ (বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়)-এর একটি প্রকার। কারণ এখানে ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য থেকে লব্ধ লাভের পরিমাণ ক্রেতার কাছে বিশ্বস্ততার সাথে বিক্রেতার উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে মুরাবাহা সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল প্রচলিত মাধ্যম। এটি বর্তমানে সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ, পণ্য আমদানি-রফতানি এবং স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের একটি মাধ্যম।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হজরত হাকিম বিন হিযাম রা. বলেন, রাসুল সা. তাকে এক দিনার দিয়ে বাজারে প্রেরণ করেন একটি বকরী কেনার জন্য। তিনি গিয়ে এক দিনার দিয়ে একটি দুম্বা কিনে দুই দিনার দিয়ে বিক্রি করেন। এরপর এক দিনারে একটি বকরী কিনে বকরী ও অতিরিক্ত এক দিনার রাসুল সা. কে এনে দেন। রাসুল সা. ওই দিনার সদকা করে দেন এবং তার জন্য ব্যবসায় বরকতের দোয়া করেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

এই হাদিস দ্বারা 'বাইয়ে মুরাবাহা' এর বৈধতা প্রমাণিত হয়।

মুরাবাহা করার কারণ: ইসলামী ব্যাংকিং যখন গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে শুরু হয় (মিশরের মিট গামার ব্যাংক), তখন কেবল মুশারাকা-মুদারাবা (প্রফিট-লস শেয়ারিং চুক্তি) দিয়েই শুরু হয়। কিন্তু উভয় চুক্তিতেই লাভ অনির্দিষ্ট (variable return) হওয়ায় এবং মুদারিব ও শেয়ার হোল্ডারের আমানতের সম্পর্ক থাকায় এবং উভয় পক্ষ প্রফিট-লস শেয়ারে আগ্রহী কম হওয়ায়, একই সাথে সুদভিত্তিক ঋণ সহজলভ্য হওয়ায়, ফিক্সড রিটার্নের শরীয়াহ মোতাবেক বিকল্প হিসেবে মুরাবাহা বিক্রয়কে সামনে আনা হয়। তবে মুরাবাহা যেহেতু একটি বিক্রয় চুক্তি, তাই কেবল যেসব ক্ষেত্রে গ্রাহকের কোনো কিছু ক্রয়ের জন্য টাকার প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রেই মুরাবাহা করা যায়। শুধু ক্যাশ প্রয়োজন হলে মুরাবাহা করার সুযোগ নেই।

উদাহরণস্বরূপ: গ্রাহকের গাড়ি ক্রয়ের জন্য বা ফ্রিজ কেনার জন্য অথবা অফিস ফার্নিচার ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখনই কেবল মুরাবাহা চুক্তি করার সুযোগ আছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মুরাবাহার হার ৬৯% এর মতো। বিশ্বে কোথাও কোথাও তা ৯৯% ও আছে।

মুরাবাহা যেভাবে করা যায়: মুরাবাহা এমন একটি বিক্রয় চুক্তি, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে তার ক্রয়মূল্য বা খরচ বলে দেয়। আমাদের বাজারে এর ব্যবহার প্রচুর বিক্রেতা পণ্যের দরদামের মাঝে হঠাৎ করেই বলে ফেলেন, "ভাই, এইডা আমার কেনা দাম!" বা "ভাই, আমার লাভ থাকবো দশ টাকা"। যদিও এক্ষেত্রে অনেক সময় তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তবে, এভাবে ক্রয়মূল্য বা লাভ উল্লেখ করলেই চুক্তিটা মুরাবাহা বিক্রয় হয়ে যায়।

ব্যাংকিং মুরাবাহা: প্রচলিত এ মুরাবাহা আর ব্যাংকিং মুরাবাহার মাঝে একটু পার্থক্য আছে। প্রচলিত মুরাবাহায় বিক্রেতা পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে, ক্রেতা এসে দাম জিজ্ঞাসা করে দরদামের পর ক্রয় করে নিয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাংকের বিষয়টি এমন নয়। ব্যাংকের মূল কাজ আর্থিক লেনদেনে মধ্যস্থতা করা। পণ্য বিক্রয় ব্যাংকের কাজ নয়। কাজেই ব্যাংকের কাছে সাধারণত পণ্য থাকে না। কাজেই এখানে ক্রেতা প্রথমে তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যের বিবরণ পেশ করে, এরপর ব্যাংক এক বা একাধিক সাপ্লায়ারের (বিক্রেতা) কাছ থেকে পণ্যটির কোটেশন বা মূল্য বিবরণী নেয়। ইতোমধ্যে ক্রেতা একটি ওয়াদা প্রদান করেন যে, ব্যাংক যদি পণ্যটি ক্রয় করে, তাহলে তিনি তা ব্যাংকের কাছ থেকে ক্রয় করবেন। এরপর ব্যাংক মূল বিক্রেতার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেয় এবং বিক্রেতা পণ্যটি ব্যাংককে হস্তান্তর করে। এখন পণ্যটির মালিক ব্যাংক। এ পর্যায়ে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা চুক্তি করে, অর্থাৎ পণ্যের ক্রয়মূল্য বা খরচ ও লাভ উল্লেখপূর্বক তা গ্রাহকের কাছে

বিক্রয়ের চুক্তি করে। সবশেষে গ্রাহক পণ্য বুঝে নেয় এবং চুক্তি অনুযায়ী একবারে বা একাধিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করে।

সুদি ঋণের বিকল্প মুরাবাহা: ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ প্রদান ও গ্রহণ যেহেতু হারাম তাই সুদি ঋণের বিকল্প হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাইয়ে মুরাবাহা ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই মুরাবাহার পদ্ধতি গ্রহণ করে বেশ ভালো ফল পাচ্ছে। যেমন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো গ্রাহকের বাড়ি বানানোর প্রয়োজনে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সুদি ব্যাংক থেকে এই অর্থ গ্রহণ করলে সুদি ব্যাংক তার কাছে ঋণের ওপর সুদ গ্রহণ করবে। সুদ থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা চুক্তি করতে পারে। যেমন কোনো গ্রাহকের বাড়ি তৈরিতে এক কোটি টাকার প্রয়োজন। সে এক কোটি টাকা দিয়ে বাড়ির রড সিমেন্ট কিনবে তাহলে সে ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে বরং দ্রব্যটিই সরাসরি ব্যাংকের কাছ থেকে মুরাবাহার ভিত্তিতে কিনতে পারে। এ ধরনের গ্রাহকদের সাথে ব্যাংক এ মর্মে চুক্তি করতে পারে যে, আমরা এই দ্রব্যটি ক্রয় করে শতকরা ১০% লাভে আপনাকে সরবরাহ করব। উভয়পক্ষ সম্মত হলে বৃহৎমানের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক এ ধরনের মুরাবাহার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। মুরাবাহা নগদ ও বাকি উভয় ধরনের হতে পারে। নগদ মূল্য পরিশোধ করলে ক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা যত টাকা লাভ ধার্য করা হবে, ছয় মাস বা এক বছর পরে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে লেনদেন করা হলে ক্রয় মূল্যের ওপর সংযোজিত লাভের হার অবশ্যই বেশি ধার্য করা যাবে। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ বিনিয়োগ করছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য মুরাবাহার সব শর্ত মেনে চলতে হবে। অন্যথায় সামান্য কারণেই তা সুদে পরিণত হতে পারে।

বাইয়ে মুরাবাহার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অনেক দেশের ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহাকে অর্থায়নের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এটি কোনো অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এটি হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির এক বিশেষ প্রকার বেচাকেনার নাম। তাই বেচাকেনার মৌলিক বিধি-বিধানগুলো এতে লক্ষ্য রাখা জরুরি। বেচাকেনার মৌলিক বিধি-বিধানের প্রতি অবহেলা করলে কোনো বেচাকেনাই শরিয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধতার রূপ পায় না। তবে মুরাবাহা অর্থায়নের কোনো পদ্ধতি না হলেও একে কিছু শর্তসাপেক্ষে অর্থায়ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা যায়। সেটা হতে হবে সীমিত পরিসরে এবং শুধু সুদ থেকে বাঁচার কৌশল হিসেবে। তবে মুরাবাহাকে কখনই বিনিয়োগের আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থায়নের আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে 'মুদারাবা' ও 'মুশারাকা'। কোথায়ও যদি যৌক্তিক কারণে মুশারাকা বা মুদারাবাকে গ্রহণ করা না যায়, সেখানে প্রয়োজনের খাতিরে ফুকাহায়ে কেরাম সীমিত পরিসরে মুরাবাহার ব্যবহারের অনুমতি

দিয়েছেন। তাই মুরাবাহার ব্যবহার শুধু সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে অর্থায়নের মৌলিক ও আদর্শ পদ্ধতি মুদারবা ও মুশারাকা প্রয়োগ করা যায় না।

বাকিতে বেচাকেনা:

সুদের পরিবর্তে ইসলামে বাকীতে বেচাকেনা বৈধ করেছে। নগদ বিক্রি মূল্যের চেয়ে বাকীতে বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয। মানুষের সুবিধার্থে এবং সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত হতে ইসলাম এ বেচাকেনা বৈধ করেছে।

কর্যে হাসানা:

ইসলাম কর্যে হাসানা তথা বিনা লাভে ঋণ প্রদানের জন্য উৎসাহিত করেছে। কর্যে হাসানা তথা বিনা লাভে ঋণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের সংস্থা হওয়াকে উৎসাহিত করেছে। ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সরকারী বা বেসরকারী যেকোনো ধরণের সংস্থাকে এ ঋণের
জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে; যাতে উম্মাতের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সহযোগিতা ও দায়ভার বাস্তবায়িত হয়।

যাকাত:

ইসলাম যাকাতের বিধান প্রচলন করেছে। ইসলাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অভাবী ফকিরকে, বিপদগ্রস্ত পথিক প্রভৃতি অভাবী মানুষের প্রযোজন মিটাতে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে যাকাতের বিধান প্রচলন করেছে। সমাজে ব্যক্তির প্রযোজন মিটাতে ও মানুষের সম্মান সংরক্ষণে ইসলাম উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ খুলে দিয়েছে। এভাবে তার অভাব মিটাতে সে সুউচ্চ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং তার প্রযোজনের সুরহা হয়; কর্ম ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী বিধি-বিধান কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশোধ কিংবা প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক নয়। বরং নাম ও তাৎপর্যগত উভয়দিক থেকেই ইসলাম মানব সমাজের জন্য একটি কল্যাণকর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শ। তাই তার অর্থায়ন পদ্ধতিতেও নিন্দিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন অবকাশ নেই তদ্রূপ সমাজতন্ত্রের শোষনমূলক অর্থব্যবস্থারও কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির আদর্শিক রূপ হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা পদ্ধতিতেও সমকালীন বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণ অর্থায়নের অনুমতি দিয়েছেন।

ইসলামী অর্থায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতা। আর বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে আধুনিক যুগের পারস্পারিক অর্থায়ন সহযোগিতার উন্নত পদ্ধতি। ইসলাম পারস্পারিক সহযোগিতামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি।

সুদের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে। ব্যাংক নিশ্চয়ই কল্যাণকর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত সূদভীত্তিক ব্যাংক হলো পুঁজিপতিদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়। কারণ এটা হলো সম্পদ বাড়ানোর ও সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং গরীবদের শবদেহের উপর পুঁজির গগনচুম্বি অট্টালিকা তৈরি করার উত্তম হাতিয়ার। তবে অর্থায়ন পদ্ধতির যে চিত্র ইসলাম পেশ করেছে তা পৃথিবীতে যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

সুদবিহীন ব্যাংক এক সময় ছিল অকল্পনীয়, এখন তা বাস্তব। পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সঠিক হলে সুদী ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক অধিকতর সফল হবে, থাকবেনা দারিদ্রতার চরম কষাঘাত, প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা। আমরা ফিরে পাবো শান্তির সমাজ। অর্থায়ন পদ্ধতির যে চিত্র ইসলাম পেশ করেছে তা পৃথিবীতে যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইসলামী অর্থনীতি, সাইয়েদ আ'লা মওদূদী, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী,২০০৯)।

২. অর্থনীতিতে রাসুলের (সা.) দশদফা, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।

৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, সাইয়েদ আ'লা মাওদূদী,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী,২০১৩)।

৪. ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, ড. এম উমর চাপরা,(ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামি থ্যাট, ২০১১)।

৫. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, সাইয়েদ আ'লা মওদূদী,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৮)।

৬. ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,(ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৪)।

৭. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, সাইয়েদ আ'লা মওদূদী, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৬)।

৮. ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান, শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫)।

৯.ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম(রহ.), (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২)।

১০. ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, আবুল ফাতাহ মুহা: ইয়াহইয়া, (ঢাকা: কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০১)।

১১. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি, মুফতী তকি উসমানী দা.বা., (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১১)।

১২. ইসলামি অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (রাজশাহী, ২০০১)।

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:,১৯৯৬)।

১৪. ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, শাহ আব্দুল হান্নান, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী,১৯৮৭)।

১৫. ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা কর্তৃক প্রদত্ত শিট

১৬. ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ইউসুফ আল-কারযাভী, (ঢাকা: সৃজন প্রকাশনী, ১৯৯১)।

১৭. ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, মুহম্মদ আবদুল হামিদ, (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)।

১৮. https://www.quranshareef.org

১৯. https://ihadis.com/

২০. https://www.hadithbd.com/hadith

২১. https://ahlehaqmedia.com
২২. https://ifatwa.info/
২৩. https://theiqra.org
২৪. https://at-tahreek.com
২৫. www.alkawsar.com